শ্রীঅমলা দেবী প্রণীত

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাম-কুলগাছিয়া ; পোঃ মহিষরেখা

জেলা-হাওড়া

১৩৫৬

আমার পরলোকগতা মা-এর উদ্দেশে
উৎসর্গীকৃত হইল

সূচী

দাসী

ভাদ্রের শেষ। তবু বর্ষা যেন যাই যাই করিয়াও যাইতে চাহিতেছে না। কয়দিন ধরিয়া প্রবল বিক্রমে বাদল নামিয়াছে; চারিদিক জলে থৈ থৈ করিতেছে; পথ-ঘাট জলে কাদায় পিচ্ছিল। অনেকক্ষণ সকাল হইয়াছে; তবু এই বর্ষায় কাহারও বাড়ীর বাহির হইবার উৎসাহ নাই। তবে যাহাদের বাহিরে না গেলে চলে না, তাহারাই জন-বিরল পল্লী-পথে ভিজিয়া ভিজিয়া যাতায়াত করিতেছে।

এমনই সময়ে একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা বিধবা স্নানান্তে সিক্ত-বস্ত্রে, কলসী কক্ষে লইয়া অতি সাবধানে পা টিপিয়া পুকুর হইতে উঠিয়া আসিতেছিলেন। উঁচু পাড়ওয়ালা বিস্তৃত পুষ্করিণী; বোধ করি, নূতন পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে; পুষ্করিণীর চারি পাড়ে তরিতরকারীর বাগান; অসংখ্য লাউ-কুমড়ার চারা সুদীর্ঘ ঘন সবুজ ডগা মেলিয়া পুকুরের চারিদিক ঢাকিয়া দিয়াছে। বিধবা আসিতে আসিতে পথের পাশে একটি কলস দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং কলসের অধিকারিণীকে দেখিবার জন্য পুকুরের পাড়ের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন, ঘোষেদের বৃদ্ধা গিন্নী-ঠাকরুণ একটা ঝিঙ্গাগাছের নীচে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখিনী হইয়া সুপুষ্ট ঝিঙ্গাগুলিকে পট পট করিয়া ছিঁড়িয়া কোঁচড় ভর্ত্তি করিতেছেন। বিধবা দাঁড়াইয়া রহিলেন—বোধ করি মৃদুহাসি চকিতের জন্য ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল; কিন্তু বৃদ্ধার কোন দিকে লক্ষ্য নাই; সুগভীর মনোনিবেশের সহিত পরম যত্নসহকারে তিনি তাঁহার কাজ করিয়া চলিয়াছেন। অনতিবিলম্বে কোঁচড় প্রায় ভর্ত্তি হইয়া আসিল এবং তা ছাড়া চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া নাগালের মধ্যে আর একটিও ঝিঙ্গা দেখিতে পাইলেন না—অগত্যা বৃদ্ধা কাছাকাছি কুমড়া ও লাউগাছগুলির উপরও একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া—ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া পথে আসিয়া পড়িতেই বিধবাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন, তবু সপ্রতিভভাবে কহিলেন, "এই যে মা লক্ষ্মী, এই বৃষ্টিতেও বেরিয়েছ ?"

মৃদুকণ্ঠে বিধবা কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু আপনি ?"

বৃদ্ধা যেন কিছু বলিবার সুযোগ পাইয়া বর্ত্তিয়া গেলেন। কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া এবং যথা-পরিমাণ ক্ষোভ মিশাইয়া কহিলেন, "আমার কথা ছেড়ে দাও মা; যত দিন না চিতেয় উঠছি—ততদিন কি আমার ছুটী আছে! কাল সারারাত্রি বাতের বেদনায় কোমর নিয়ে উঠতে পারিনি, সকালে বৌ দুটিকে ডেকে বললাম, আজ আর পারছিনে মা, তোমরাই দুজনে ব্যবস্থা কর—তা কে কার কথা শোনে। বড় বৌটি ত এখনও সকালের মুখ দেখেন নি; ছোটটি একবার উঠেছিলেন—আবার গা-হাত-পা মুড়ে শুয়েছেন। গতিক দেখে, ভাঙ্গা কোমর নিয়েই উঠতে হ'ল মা। সেই ন'বছর বয়স থেকে এই সংসারে ঢুকেছি, একদিন গা-হাত-পা মেলে শুতে পেলাম না।"

অতঃপর ঝিঙ্গাগুলিকে কোঁচড় হইতে বাহির করিয়া এক একটি করিয়া কলসের মধ্যে রাখিয়া আবার কহিলেন, "তরকারীর ডালিতে দেখি, এক টুকরা ডাঁটা পর্য্যন্ত নাই; তাই ভাবলাম, যাই একটা ডুবও দিয়ে আসি আর গাঙ্গুলী ভাসুরপোর বাগান থেকে দু'চারটে যা পাই নিয়ে আসি। গিলতে ত হবে মা! আর, এই বুড়ীকেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলে, বৌ, এখন সব আরাম করে শুয়ে থাকবেন, কিন্তু খাবার সময় একে একে সব হাজির হবেন। তা মা তোমাদের বাড়বাড়ন্ত হ'ক, তোমরা গাঁয়ে আছ বলে—গাঁয়ে বাস করা চলছে, নইলে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হ'ত।"

ঝিঙ্গাগুলি রাখিয়া কাছে আসিয়া কহিলেন, "তা-ও বলি মা, গাঙ্গুলীদের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা। তোমরা তখন আসনি মা, বোধ করি জন্মাও নি, আমিই তখন কনে-বৌ। আমাদের তখন এমন পড়তি অবস্থা ছিল না; শ্বশুর ছিলেন বড়াইপুরের গোমস্তা; পালকী ছাড়া এক পা চলতেন না; লোকজনে বাড়ী রাতদিন গম্‌গম্ করত। তোমার শ্বশুর ছিলেন আমার শ্বশুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু; একদিন দু'জন দু'জনাকে না দেখলে বোধ হয় তাঁদের ঘুম হ'ত না।"

একটু হাসিয়া কহিলেন, "মনে পড়ে—এক দিন এমনি বাদল—রাতদিন ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি; তোমার শ্বশুর কোন ভিনগাঁয়ে গেছলেন; রাত দু'পুরে আমাদের বাড়ী গিয়ে হাজির।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঝিঙ্গা-সম্পর্কিত কথা ছাড়িয়া অন্য কথা পাড়িলেন, "সরুর কোন খবর পেয়েছ মা ?"

বিধবা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন "পেয়েছি। বেয়াই পাঠাতে রাজী হয়েছে। ছেলে হল না বলে, শাশুড়ী দিনরাত গঞ্জনা দিচ্ছে; সেই ত মেয়ে; মুখ তুলে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, চুপ করে হয়ত কেবল কাঁদছে। তাই ভাবছি এবার তাকে নিয়ে এসে বীরাষ্টমীর ব্রত করাব। আমাদের মা ত জাগ্রত দেবী; অনেকে নাকি সদ্য সদ্য ফল পেয়েছে।"

বৃদ্ধা যেন শিহরিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তেল মাখা গা-এ পেরনাম করব না মা, কিন্তু এমন জাগ্রত দেবী আর দেখি নি। মন্দিরের কাছ দিয়ে গেলেও গা ছম্‌ছম্‌ করে; কত লোক স্বচক্ষে দেখেছে, গড়-পুকুরের সিঁড়িতে বসে ষোল বছরের পরমা সুন্দরী মেয়ে ঘাট আলো করে জলে পা দুটি ডুবিয়ে বসে আছে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার সর্ব্ব শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "তাই কর মা! সরুকে বীরাষ্টমীর ব্রত করাও; সারা দিনরাত জলস্পর্শ না করে মা-এর কাছে মানত করাও—কোলে একটি কার্ত্তিকের মত খোকা হ'ক, একশ আট পদ্ম দিয়ে মাকে পূজো করবে, 'সচুল' 'সকাপড়ে' মা-এর সামনে ধূনো পোড়াবে, বছরের মধ্যে যদি ফল না পাও ত এই বুড়ীকে ব'লো। তা যাও মা, ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়িয়ে থেক না।"—বলিয়া বৃদ্ধা কক্ষে কলস লইয়া পুকুরে নামিয়া গেলেন।

এই বিধবা রমণী গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ গাঙ্গুলীদের পুত্রবধু! ইঁহার পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম কৃষ্ণভামিনী। কিন্তু, এখন সে নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিবার কেহ বাঁচিয়া নাই; তাই সকলে সে নাম ভুলিয়া গিয়াছে, বোধ করি, তিনিও ভুলিয়াছেন। বাড়ীতে এবং গ্রামের সকলের কাছে তিনি 'ছোট বৌ' বলিয়া পরিচিত। তাঁহার স্বামী এই গৃহের সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন, তাই স্বামীহীনা হইয়াও তিনি স্বামীর পদবী বহন করিতেছেন।

সতের বৎসর বয়সে, দুই বৎসরের মেয়েকে কোলে লইয়া কৃষ্ণভামিনী বিধবা হন। স্বামী সখ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন, সরমা। দুর্ভাগ্যের জোয়ার কাটাইয়া এই মেয়ে একদিন বড় হইয়া উঠিবে, স্বামীর মৃত্যুর পর-মুহূর্ত্ত হইতে সে আশা কোন দিন বিধবা করেন নাই। তাই মেয়ের দিকে কোনও দিন ভাল

করিয়া তাকান নাই, তাকাইবার অবসরও হয় নাই। স্বামীর শ্রাদ্ধের পরদিন হইতে তাঁহার ভাসুর ও ভাসুর-পত্নীর সংসারের বৃহৎ ঘানিতে নিজেকে এমনি করিয়া জুতিয়া দিয়াছেন যে, ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলিবার পর্য্যন্ত তাঁহার অবকাশ থাকে না, মেয়ে কোথায় কাহার কাছে আছে, কি করিতেছে খোঁজ রাখা দূরের কথা। আর মেয়েও তেমনি! কোনদিন কাঁদে নাই, আবদার করে নাই, এমন কি অসুখ হইলেও কোন দিন তাঁহাকে একান্ত ভাবে চাহে নাই। তা না হইলে কি মেয়ে মানুষ হইত, না, এই সংসারে সকলের মন যোগাইয়া মাথা গুঁজিয়া থাকা চলিত?

যাই হ'ক, মেয়ে বড় হইলে কৃষ্ণভামিনী একদিন বড়-জা নয়নতারাকে, তাঁহার আহারের সময়ে, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া নিবেদন করিলেন, "দিদি! সরু একটু বড় হয়েছে না?"

নয়নতারার মেজাজ ভাল ছিল; স্বামীর পরিত্যক্ত বড় মাছের মুড়োর স্বল্পাবশেষ খণ্ডটিকে ভাল করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন, "তা, হবে না ভাই? ষেটের কোলে তের বছরেরটি হয়েছে; আমার নিরুর চেয়ে ত দু' বছরের ছোট। তা এর পর বে-থা দিতে হবে। তোর ভাসুরও সেদিন বলছিলেন।"

কৃষ্ণভামিনীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; একটু সরিয়া বসিলেন, দুধের বাটীটা আগাইয়া দিলেন এবং দ্রুততর গতিতে পাখা করিতে করিতে কহিলেন, "কি বলছিলেন দিদি?"

নয়নতারা কহিলেন, "বিয়ের কথাই বলছিলেন। কুসুমপুরে না কি একটি ছেলে আছে, ঘর বেশ ভাল; জমি-জায়গা পুকুর-বাগান আছে; ছেলেটি মন্দ নয়; ভাত-কাপড়ের জন্যে ভাবতে হবে না।"

কৃষ্ণভামিনী উৎসুককণ্ঠে কহিলেন, "ছেলেটি কি করে দিদি? লেখাপড়া শিখেছে?"

নয়নতারা কহিলেন, "পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কি আর করবে ভাই? লেখাপড়া একটু আধটু শিখেছে; বাপের জমি-জায়গা দেখা-শুনা করে, চাষবাস করে, এই আর কি?"

কৃষ্ণভামিনীর মুখখানি নয়নতারার অলক্ষ্যে মুহূর্ত্তের জন্য কাল হইয়া উঠিল; তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

বড়-জা দুধে ভাত ও কলা মাখিতে মাখিতে কহিলেন, "আমার নিরুর বর খুঁজতে তোর ভাসুরকে কি কম ছুটোছুটি করতে হয়েছিল? তাই না দেশের সেরা ছেলেটি পেয়েছেন। তেমনি অবশ্যি টাকাও খরচ করতে হয়েছে। সরুর বিয়েতে কি তেমন খরচ করতে পারবেন? এমনি ত বলছিলেন, ধানটান হয় নি, প্রজারা খাজনা দিচ্ছে না, সরকারের খাজনা মেটাতে বোধ করি তালুক বিক্রী করতে হবে। সরুর বিয়ে তাই নামে-নামেই সারতে হবে।" "তা' ছাড়া বাড়ীতে ত মেয়ে একটি আধটি নয়, ষেটের কোলে দশ পনেরটি মেয়ে। সকলের বিয়েই যদি চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে করে দিতে হয়, তা হলে যে একেবারে ফতুর হয়ে যেতে হবে। তবে নিরুর কথা? সে হল বাড়ীর বড় মেয়ে; তার বিয়ে যা তা করে দিলে সমাজে যে মুখ দেখান চলত না, ভাই।"

শেষে কুসুমপুরেই বিবাহ স্থির হইল। বেশী দূর নয়, চার পাঁচ ক্রোশের মধ্যে। বরের বাবা সম্পন্ন ব্যক্তি। ছেলেটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে। লেখাপড়া বেশী না জানিলে কি হয়, ডাক্তারী শিখিয়াছে; ডাক্তারী করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করে। এরকম পাত্র যদি কৃষ্ণভামিনীর পছন্দ না হয় তো তাঁহার মেয়ের বিবাহ দিবার প্রয়োজন নাই। তুলা ও কর্পূর দিয়া মুড়িয়া মেয়েটিকে সিন্দুকে পুরিয়া রাখুন। কৃষ্ণভামিনী অবশ্য প্রথমটা খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিলেন, শেষে নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, তাঁহার মত হতভাগিনীর অদৃষ্টে এইই যে জুটিয়াছে, তাই ঢের; এখন ভগবানের কৃপায় তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, সুখে শান্তিতে সংসার করুক।

শ্রাবণের শেষে বিবাহ। বাজনা-বাদ্যিও নাই, লোকজনও নাই। বড়-জা কহিলেন, "এই বর্ষাতে কেও বাড়ীর বার হতে পাচ্ছে না, কে আর তোমার মেয়ের বিয়েতে রসুনচৌকী বাজাতে আসবে ভাই?" আড়ালে মেজ-জাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ছোট বৌ-এর কিছুতেই মনস্তুষ্টি হয় না। কেবল খুঁৎ খুঁৎ করেই মরছেন। একা মানুষ কত দিকে করবে ভাই? ঠাকুরপোরা কেউ কুটিটি পর্য্যন্ত নাড়ছে না।"

মেজ-বৌকে হাসিয়া সায় দিতে হইল। তাহারও মেয়েটি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে; স্বামীকে তাগিদ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?

যা হ'ক, বিবাহ একরকম করিয়া শেষ হইল। বিবাহের সময়েও কৃষ্ণভামিনী দূরে সরিয়া থাকিলেন, চোখ চাহিয়াও দেখিলেন না। পাছে তাঁহার মত পোড়া-কপালীর সংস্পর্শে শুভকার্য্যে কোন অশুভ ঘটে। তবু রান্নাঘরে কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার অন্তরতলবাসিনী জননী একমাত্র কন্যার জন্য নিরন্তর এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, "চিরায়ুষ্মতী হও। চির-সুখিনী হও। আমার দুর্ভাগ্যের বিন্দুমাত্র তাপও তোমাকে যেন স্পর্শ না করে।" স্বামীকে স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল; তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এমন নিষ্ঠুর হয়ে কোথায় রইলে? তোমার কত আদরের সরমার বিয়ে, একবার চোখে দেখে গেলে না?"

মেয়ে-জামাই চলিয়া গেল। যাত্রার সময়ে তিনি চোখের জল বেশ করিয়া মুছিয়া, একবার গিয়া ধান্যদূর্ব্বা দিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু তখনই আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

জায়েরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ধন্যি মেয়ে বাবা! একবার চোখ পেড়ে দেখলে না! ঠাকুরপোর জন্যে একটু চোখের জল পর্য্যন্ত ফেললে না! আমরা হলে—"

বড়-জা বাধা দিয়া কহিলেন, "আর হ'য়ে কাজ নাই ভাই। হওয়ার সুখ তো কত। তবে ছোট-বৌ একটু শক্ত বটে, দেখিস না একমাত্র মেয়ে, আর হবারও আশা নাই, তবু মেয়ে যেন কার না কার!"

মেজ-জা কহিলেন, "ওর সবই বাড়াবাড়ি। দেখান, কতই না কাজ করছেন, চোখে দেখবার পর্য্যন্ত সময় পান না। কাজ ত আমরাও করি দিদি! তবে ওরকম ঢাক পেটাই না বটে।"

বিবাহের পরই ভাদ্র মাস। বাড়ীর কুকুর-বিড়ালকে লোকে এ সময়ে তাড়ায় না তো, বাড়ীর পুত্রবধূ। তারপর আশ্বিন ও কার্ত্তিক শ্বশুর-বাড়ীতে থাকিয়া সরমা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু, একমাস গত হইতে না হইতেই আবার যাইবার জন্য তাগিদ আসিল। মায়ের আঁচল ধরিয়া থাকিবার জন্য তাঁহারা পুত্রের বিবাহ দেন নাই। তা ছাড়া মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া মাতৃ-স্তন্য পান করিবার বয়সও পুত্রবধূর আর নাই। কৃষ্ণভামিনীও বিন্দুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন; তাহার উপর আর অধিকার কি?

সরমা কিন্তু যাইবার সময়ে ভারী কান্নাকাটি করিল। মাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কৃষ্ণভামিনী জোর করিয়া চোখের জল ফিরাইয়া সান্ত্বনা দিলেন, "ছিঃ মা! কাঁদতে নাই। সে-ই তো তোমার নিজের বাড়ী। নিজের বাড়ী যাবে, তাতে কাঁদতে আছে? ছিঃ। শশাঙ্ক কি মনে করছে বল দেখি?"

শশাঙ্ক জামাই; মুখ নীচু করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল।

এ রকম ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে জানিলে সে এ কাজের ভার লইত না। সরমা কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইল না, কাঁদিতে কাঁদিতে পালকীতে উঠিল। বোধ করি, সারা পথ কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছিল। কন্যাকে বিদায় দিয়াই কৃষ্ণভামিনী আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া জায়েরা এক সঙ্গে গালে হাত দিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল।

বাস্তবিক কৃষ্ণভামিনীর প্রত্যেক কার্য্যে আশ্চর্য্য হওয়া তাঁহার জায়েদের অভ্যাস ছিল। যদি একমাত্র কন্যার বিদায় মুহূর্ত্তে কৃষ্ণভামিনীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত, যদি পরলোকগত স্বামী ও দূরগামিনী কন্যার জন্য ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতেন, তাহা হইলেও ইহারা জটলা করিয়া আশ্চর্য্য হইত এবং গালে হাত দিয়া বলাবলি করিত, "ছোট-বৌ-এর ঢং দেখে বাঁচিনে। হিল্লী নয় দিল্লী নয়, যাচ্ছেন তো কুসুমপুর, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়, তা এত কান্না কিসের ভাই! মেয়ে তো কারও নাই! কেউ শ্বশুর-বাড়ীও পাঠায় নাই। ছোট বৌ-এর সবই বাড়াবাড়ি।"

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। কৃষ্ণভামিনী মাঝে মাঝে সরমার সংবাদ পাইতেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর একমাত্র পুত্রবধূ, আদর আহ্লাদের অভাব নাই। তবে, মাস-খানেক আগে সংবাদ পাইয়াছেন, সরমা এখনও মা হইতে পারে নাই বলিয়া তাহার শাশুড়ী তাহাকে ভারী গঞ্জনা দিতেছে। তাহার পনের বৎসর বয়স হইয়াছে, অথচ এখনও বংশধরকে মর্ত্ত্যভূমিতে আনয়ন করিতে পারে নাই, বংশের একমাত্র পুত্রবধূর ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে? তিনি নিজে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে সন্তানবতী হইয়াছিলেন, তাঁহার শাশুড়ী ঠাকরুণ বার বৎসর বয়সেই মাতৃত্ব গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার পুত্রবধূ, পনের বৎসর পার হইতে চলিল, অথচ বেশ চুপ করিয়া আছে, কোন খেয়াল নাই! সে কি মনে করে তাহার জন্য বংশের পিণ্ডলোপ হইবে? পূর্ব্বপুরুষগণ একবিন্দু

জলের জন্য পরলোকে হা হা করিয়া বেড়াইবেন ? তিনি আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন ; যদি ইহার মধ্যে পুত্রবধূ সন্তান প্রসব করিতে পারে, ভাল, নচেৎ তাঁহাকে আবার পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে।

মর্ম্মান্তিক সংবাদ। যে দিন হইতে কৃষ্ণভামিনী এ সংবাদ শুনিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে। একে তো নিজের দুর্ভাগ্যের নিদারুণ দহনে অহর্নিশ জ্বলিতেছেন, তাহার উপরে যদি একমাত্র কন্যা স্বামী-গৃহচ্যুতা হইয়া তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে বজ্রাহত বৃক্ষের মত পলে পলে দগ্ধ হইতে থাকে, তাহা হইলে সংসারে তাহার আর বাঁচিয়া থাকিবার কি রহিল ? কিসের জন্য ও কাহার জন্য তিনি এতদিন এই স্নেহ-দরদহীন সংসারে অশেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতেছেন ? গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় মাথা ঠুকিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে দেবতা ! প্রসন্ন হও, মুখ তুলিয়া চাও, আর কত দিন মুখ ফিরাইয়া থাকিবে ? কি পাপ করিয়াছি জানি না, কিন্তু নারী-জীবনের চরম দণ্ড দিয়াও কি তোমার সাধ মিটে নাই ? আবার সেই বজ্র একমাত্র কন্যার উপরে উদ্যত করিয়াছ ?" কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসে—বলিতে থাকেন, "জীবনে তাহার কি আছে ? পিতা নাই, মাতা থাকিয়াও নাই। স্বামী-সুখ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিও না, ঠাকুর !"

একদিন দুপুর বেলায় আহারাদির পর বড়-জা মেজেতে মাদুর পাতিয়া ভাদ্রের গুমোট গরমে ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণভামিনী কাছে আসিয়া বসিলেন এবং পাখা করিতে করিতে ডাকিলেন, "দিদি !"

নিরতিশয় আরামে দিদির চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল ; তেমনি ভাবেই উত্তর দিলেন, "উঁ"। কৃষ্ণভামিনী কহিলেন, "সরুর ছেলে হয়নি বলে বেয়ান নাকি শশাঙ্কর আবার বিয়ে দিচ্ছে।"

আসন্ন-প্রায় নিদ্রাকে আপাততঃ বিদায় দিয়া বড়-জা কৃষ্ণভামিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া কহিলেন, "কেন সরুর কি ছেলে হবার বয়স পার হয়ে গেছে না কি ? কে তোকে বললে ?"

কৃষ্ণভামিনী কহিলেন, "সবাই বলছে। ও পাড়ার কে কুসুমপুর গিছল। বেয়ান নাকি তাকে ডেকে বসিয়ে এই কথা বলেছে। সরমার সঙ্গে দেখা হয়নি। দূর থেকে দেখেছে—মুখখানা শুক্‌নো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

বড়-জা বলিতে লাগিলন, "পাড়াগাঁয়ে সবই অনাছিষ্টি। সাধে কি নিরুর বিয়ে আমি পাড়াগাঁয়ে দিতে চাইনি? নইলে ন-গাঁয়ের জমিদারের বাড়ীতে একটি ভাল ছেলেও ছিল, তোর ভাসুর ঝুঁকেছিলেন। শুধু আমি বেঁকে বসলাম বলেই ত হল না।" স্বীয় বুদ্ধিমত্তার এই অসন্দিগ্ধ প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া পরম আত্মপ্রসাদে তাঁহার মুখখানি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তা ভাই যেমন দেখে শুনে দিয়েছিলাম, তেমন মেয়েটি আমার সুখে আছে, এ সব জ্বালা-জঞ্জাল নাই। নইলে নিরু ত আমার সতের পার হয়ে গেল, এখনও ছেলেপিলে হল না, তা কি বেয়াই, বেয়ান কারও টুঁ শব্দটি নাই। আমিই বরং ব্যস্ত হয়েছি! এবার পূজোতে মেয়ে-জামাই আসবে বলেছে; তাই ভাবছি নিরুকে এবার বীরাষ্টমীর ব্রত করাব। তা তুই ভাবিস্ নে। আমি তোর ভাসুরকে বলে কুসুমপুরে চিঠি দেওয়াচ্ছি; সরুকে পূজার সময় পাঠিয়ে দিক। দুজনে একসঙ্গে ব্রত করবে এখন।"

২

আশ্বিনের শেষে পূজা। পূজার দুইদিন পূর্ব্বে শশাঙ্ক সরমাকে লইয়া আসিল। নিরু ও তাহার স্বামী ইতিমধ্যে পৌছিয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগকে লইয়া বাড়ীসুদ্ধ সকলে এমনি মাতামাতি করিতেছে যে, আর কোন দিকে মন দিবার কাহারও অবকাশ নাই। কৃষ্ণভামিনী সরমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখিস যেন শশাঙ্কর বিন্দুমাত্র অসুবিধে না হয়; সব সময়ে নজর রাখবি, আর সকলের মত ভুলে থাকিস নে।"

ম্লান চোখ দুটি কন্যার মুখের পানে তুলিয়া কহিলেন,"তুই ত সব জানিস্ মা। আমাকে তোরা ভুল বুঝিস্ নে; শশাঙ্ককে বুঝিয়ে বলবি।"

শেষ রাত্রে অষ্টমী পূজা। তারপরে সন্ধিপূজা ও বলিদান। নিরু ও সরমা দুইজন সারাদিন উপবাস করিয়াছে। নিরু ত এলাইয়া পড়িয়াছে এবং ইতিমধ্যে তাহার দুইবার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইয়াছে।—দেখিয়া জামাই ও সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। সরমা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া তাহাকে পাখা করিতেছে। জামাতা বাবাজী কোন ভাল ডাক্তারকে অবিলম্বে ডাকিবার জন্য জিদ ধরিয়াছেন, কিন্তু কাছে কোন ভাল ডাক্তার না থাকায় শশাঙ্কই বার দুই দেখিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণভামিনী সমস্ত দিন উপবাসিনী এবং সারাদিন রান্নাঘরে এমনি ব্যস্ত আছেন যে, একবারও নিজের মেয়ে-জামাই-এর খবর রাখিতে পারেন নাই। তবু তাহার মধ্যেই একবার আসিয়া নিরুর কাছে বসিয়া পাখা করিয়া গিয়াছেন।

জামাতা বাবাজী একটু মোটাসোটা মানুষ। তবু যথাসাধ্য লম্ফঝম্প করিয়া শাশুড়ীকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আপনাদের পাড়াগাঁয়ের লোকদের সবই আশ্চর্য্য ব্যাপার, মা! ছেলে হবার জন্যে একটা মানুষকে মেরে ফেলতে হবে? এমন জানলে আমি আনতাম না।"

শাশুড়ী নয়নতারা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। জামাতার সম্মুখে গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা দেওয়া আজন্ম অভ্যাস; তবু সহুরে জামাই-এর পাল্লায় পড়িয়া অবগুণ্ঠনকে অল্পায়িত ও কণ্ঠস্বরকে সহরায়িত করিতে হইয়াছে।

তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া কহিলেন, "তা বাবা! তোমরা সহরের ছেলে, পাড়াগাঁ জন্মেও দেখনি। তোমাদের এসব আশ্চর্য্য লাগবে বৈকি! আমাদের পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের পনের বছরে ছেলে না হলেই চোখে অন্ধকার দেখে।" মুচকি হাসিয়া অদূরে উপবিষ্ট শশাঙ্ককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এই দেখ না, আমাদের সরুর ছেলে হয় নি বলে শশাঙ্কের বাবা আবার ওর বিয়ে যিতে চাচ্ছে।" শশাঙ্ক লজ্জিত মুখে নত মস্তকে বসিয়া রহিল। রান্নাঘরে আসিয়া বড়-জা কৃষ্ণভামিনীকে কহিলেন, "জামাই বলেছে ছেলে দিয়ে কি হবে। সহরের ছেলেদের ধরণ-ধারণ আলাদা।" জামাতৃ-গর্ব্ব তাঁহার সর্ব্বদেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডী; তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। সমস্ত গ্রামের লোকের পূজা। তবে গাঙ্গুলীরা বর্দ্ধিষ্ণু বলিয়া তাঁহারাই মুরুব্বিয়ানা করেন এবং ব্যয়ের অধিকাংশ তাঁহারা বহন করেন বলিয়া কেহ তাহাতে আপত্তি করে না। প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের পাশে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা —নাম গড়পুকুর। এ দেশে চণ্ডীদেবীর মত জাগ্রত দেবী আর নাই। তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এদেশে অনেক গল্প প্রচারিত আছে। তাই পূজার সময়ে চতুঃপার্শ্বের গ্রাম হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা পূজা দেখিতে আসে এবং ভিড়ের অন্ত থাকে না।

অষ্টমী পূজা প্রায় শেষ হইয়াছে; সন্ধিপূজা আসন্নপ্রায়। ভক্তের দল পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া কপালে, বাহুতে ও বক্ষে রক্তচন্দনের ছাপ আঁকিয়া গম্ভীর বদনে

কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ ফল কাটিতেছে। মন্দিরমধ্যে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ, চত্বরে মেয়েদের ও চণ্ডীমণ্ডপে দর্শকের কোলাহল। প্রাচীন ও প্রাচীনারা জোড় হস্তে খাড়া দণ্ডায়মান, তাঁহাদের বদনমণ্ডলে ভক্তির প্রাবল্য ফুটিয়া উঠিতেছে; কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন।

চত্বরের একদিকে বসিয়া বড়গিন্নীর কোলে মাথা রাখিয়া নিরু শুইয়া আছে। তাহাকে ঘিরিয়া একদল মেয়ে, কেহ উপবিষ্টা, কেহ দণ্ডায়মানা। বড়গিন্নী বলিতেছেন, "বড় লোকের বাড়ীতে বিয়ে দিয়েছি, সহরে থাকে, দিনান্তেও মাটীতে পা দেয় না, সূর্য্যির মুখ দেখে না, ওর কি আর এসব সয়? কি করব মা! এসব না করলেও সংসার চলে না যে! ঐ দেখ না, আমাদের সরু, বয়সে ছোট; সারাদিন উপোস দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; যাদের যেমন অভ্যেস।"

চত্বরের অন্য প্রান্তে সরমা শুইয়া আছে, ক্ষুৎপিপাসায় সারাদেহ অবসন্ন। কৃষ্ণভামিনী মন্দির মধ্যে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন; একটুখানি অবসর করিয়া মেয়ের কাছে আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "ওমা, সরু! একটিবার ওঠ, বলিদানের সময় হল, একবার উঠে দেখ।" সরমা কষ্টে উঠিয়া বসিল। কৃষ্ণভামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব কষ্ট হচ্ছে মা?" সরমা ঘাড় নাড়িল। কৃষ্ণভামিনী চারিদিকে চাহিয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, মুখে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "কি করবি মা! আর একটু কষ্ট করে থাক্, পূজা হল বলে। মায়ের কাছে বেশ ভক্তি করে বল, 'মা, মনস্কামনা পূর্ণ কর, আসছে বছর ছেলে কোলে নিয়ে ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দেব'।"

বলিদানের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে 'জয় মা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। বলি মাত্র তিনগাছি আক এক সঙ্গে আঁট সাঁট করিয়া বাঁধা; কিন্তু তাহার জন্যই ভক্তবৃন্দের এই হাঁক-ডাক। তরবারির দ্বারা সেই ইক্ষুদণ্ডত্রয়কে কাটিতে হইবে; যদি এক আঘাতে কাটে তবেই বুঝা যাইবে যে, দেবী বলি গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি বলি করিবেন, তাঁহার দেহের বহর ও তাঁহার হস্তধৃত শাণিত অস্ত্র দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তিনি তিন গাছি কেন, তেত্রিশ গাছি আক অবলীলাক্রমে কাটিয়া ফেলিতে পারেন, তবু তাঁহাকে মাল-কোচা আঁটিয়া কোমরে গামছা বাঁধিতে হইয়াছে এবং দেবীর সম্মুখে যুক্তহস্তে শক্তির প্রার্থনা করিতে হইতেছে। প্রার্থনা শেষ হইলে যথাসময়ে ব্রাহ্মণ বলি ও

তরবারি লইয়া গিয়া চণ্ডীমণ্ডপে নির্ব্বিঘ্নে বলিদান সমাধা করিলেন এবং করিবামাত্র যথারীতি মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া মন্দিরে তুলিয়া আনিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল। মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং 'তামাক' বলিয়া হাঁক দিলেন। অবিলম্বে তামাক আসিল; ব্রাহ্মণ উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ভক্তগণকে দেবী-মাহাত্ম্য শুনাইতে লাগিলেন। নাট-মন্দিরে যুবক ও বালকেরা কোলাহলে গগন বিদীর্ণ করিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল।

বড়কর্ত্তা আসিয়া কহিলেন, "রায় মহাশয়, এদিকে একবার আসতে হবে যে।" তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানান ছিল, কাজেই তখনই "এই যে যাই বাবা" বলিয়া, কলিকা পাশে রাখিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি থালায় ফুল ও বিল্বপত্র লইয়া যেখানে মেয়েরা জটলা করিতেছিল সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। কহিলেন, "কই গো মা লক্ষ্মী।"

নিরু উঠিয়া বসিল এবং ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। বড়গিন্নী অঞ্চলপ্রান্ত হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া নিরুর হাতে দিয়া সকলকে শুনাইয়া কহিলেন, "ঠাকুর মশায়ের চরণে রেখে বল্, মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক, আসছে বছর 'পাটের জোড়' দেব।" ঠাকুরমশাইয়ের চরণপ্রান্তে অদ্যাবধি এতগুলি মুদ্রা একসঙ্গে কেহ কখনও রাখে নাই। কাজেই দর্শক-বৃন্দের চক্ষু বিস্ফারিত এবং ঠাকুর মশাইয়ের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। নিরুর মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "মা চণ্ডী তোমার মনোবাসনা নিশ্চয় পূর্ণ করবেন মা। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি স্বয়ং কার্ত্তিকেয় তোমার কোলে জন্মগ্রহণ করবেন। আমার কথা কখনও বিফল হবে না, মা, তুমি দেখে নিও।"

দর্শকবৃন্দের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যেমন পুণ্যবতী মা, তেমনি মেয়ে, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।" নিরুকে কহিলেন, "মা হাত দুটি পাতো ত। প্রসাদী ফুল দিই।

নিরু অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় প্রসারিত করিল। ব্রাহ্মণ সমস্ত ফুল ও বেলপাতা উজাড় করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া দিলেন এবং টাকাগুলি কোমরে গুঁজিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

বড়গিন্নী কহিলেন, "আর একটু দাঁড়ান, আমাদের সরুও ব্রত নিয়েছে।"

ব্রাহ্মণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সরমা ভিড়ের পিছনে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, ডাক দিতেই ধীরপদে আসিয়া ব্রাহ্মণের চরণপ্রান্তে প্রণতা হইল। ব্রাহ্মণ তাহাকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং প্রণামী মাত্র একটি টাকা যথাস্থানে রাখিয়া স্বল্পাবশেষ ফুল ও বেলপাতা তাহার হাতে দিয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবী-মাহাত্ম্যেই বলিতে হইবে, পুরা একটি বৎসর শেষ হইতে না হইতে সরমা একটি পুত্র লাভ করিল। গ্রামের সকলে নিশ্চিন্ত হইল, সরমার পুত্রলাভের জন্য নহে, দেবী-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রহিল বলিয়া; কিন্তু, রায়-মহাশয়ের অদৃষ্টে বিধাতা 'পাটের জোড়' প্রাপ্তির কথা লিখেন নাই, কারণ নিরুর ক্রোড়ে কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিতে ভুলিয়া গেলেন। তাহাতে দেবীর মাহাত্ম্য বিন্দুমাত্র কমিল না, বরং ভক্তিহীনার যথোচিত শাস্তি হইয়াছে দেখিয়া সকলে মনে মনে খুসীই হইল।

মেয়েরা বলাবলি করিতে লাগিল, "বড়লোকের বৌ ভূ-ভারতে আর কেউ হয় নি ত? অষ্টমী পূজার সময়ে মায়ের কোলে শুয়ে হাওয়া খেতে লাগল। এমন ত কখন দেখি নি মা! মাও তেমনি কিছু দিলেন না। ভক্তের ভগবান্, তাঁর কাছে বড়লোক গরীবলোক কিছু বিচার নাই।".

বড়গিন্নী আঁতুড়-ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, "কই গো কেমন খোকা হল দেখি।" ধাই-এর কোলে সদ্যজাত শিশু দুই চক্ষে অপার বিস্ময় হইয়া নবলব্ধ ধরণীকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। ধাই সসম্ভ্রমে শিশুকে দুহাতে বড়গিন্নীর সাম্‌নে তুলিয়া ধরিল। বড়গিন্নী কহিলেন, "বেশ ছেলে হয়েছে; একটু রোগা, তা হ'ক। প্রথম পোয়াতির ছেলে ওরকম হয়। দুদিনে মোটাসোটা হবে এখন। সরুর মতই মুখ-চোখ হবে। তা, বেশ, বেঁচে থাকুক, মায়ের কোলজোড়া হয়ে।" পাশেই ছোট-বৌ দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "কি লো ছোট বৌ, ভারী যে ভয় করছিলি, মেয়ের ছেলে হ'ল না, বেয়ান আবার ছেলের বিয়ে দেবে; এখন আমার কথা ফল্‌ল তো?"

কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতা হাসিতেছিলেন।

সাতদিন যাইতে না যাইতে সরমাকে কঠিন রোগে ধরিল। ছোট-বৌকে

রান্নাঘর ছাড়িয়া সেবার জন্য আঁতুড়-ঘরে ঢুকিতে হইল। শিশুটিও মাতৃ-স্তন্যের অভাবে দিন দিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যা হইতে এমনি কান্না সুরু করিল যে, কিছুতেই চুপ করান গেল না। যথারীতি রোজা ডাকা হইল এবং 'জল-পড়া' খাওয়ান হইল। ক্রন্দনবেগ ক্রমে শান্ত হইয়া আসিল এবং রাত্রিশেষে শিশু একেবারে চিরদিনের জন্য চুপ করিল। ছোট-বৌ শিশুটিকে কোলে লইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন। পাশে ছিন্ন-মলিন শয্যায় রোগক্লিষ্টা সরমা মৃতের মত ঘুমাইতেছিল। শিশু একেবারে চুপ করিতেই, ছোট-বৌ অনুচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সরমাকে হাত দিয়া নাড়া দিয়া কহিলেন, "ও মা সরু ওঠ, একবার শেষ দেখা দেখে নে মা, খোকা যে চলে গেল রে।"

সরমা ধড়মড় করিয়া উঠিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "কি হ'ল মা? খোকন কৈ?" তারপর মাতার কোলে পুত্রের স্পন্দনহীন নির্জ্জীব দেহ দেখিয়া "একি হ'ল মা" বলিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সেই মৃতদেহের উপরেই লুটিয়া পড়িল।

৩

বৎসর দুই পরে, রোগজীর্ণ দেহ লইয়া সরমা শ্বশুর-বাড়ী ফিরিয়া চলিল। প্রসবের পর ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া দেহ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে, বুকের হাড়গুলি একটা একটা করিয়া গণা যায়; গাল দুইটা বসিয়া চোয়াল বাহির হইয়া গিয়াছে; হাসিলে দাঁত মাড়ি বাহির হইয়া পড়ে। চোখের কোলে সুস্পষ্ট কাল দাগ; চুল উঠিয়া গিয়া মাথায় টাক পড়িয়াছে। একদা শিশু-দেবতার আগমনীর উৎসবে যে-দেহ দেবমন্দিরের মত সুসজ্জিত হইয়াছিল, দেবতার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে সজ্জা কোন্ দিন ঝরিয়া পড়িয়াছে, আজ আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

শ্বশুর-বাড়ীর সামনে ছোট একটি আম-বাগান। সরমার পাল্কী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেখানে পাড়ার মেয়েরা জুটিয়া সকলে জটলা আরম্ভ করিয়াছে এবং উলঙ্গ শিশুর দল সমান উৎসাহের সহিত খেলা ও ঝগড়া করিতেছে। জনকয়েক উৎসাহী বালক ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া পাল্কী দেখিবার জন্য প্রায় মাইল দুই আগাইয়া গিয়াছে। পাল্কী যে তাহারা দেখে নাই তাহা নহে। তবে যে বস্তু দেখিবার

জন্য তাহাদের মায়েরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, তাহা তাহাদের পূর্ব্বেই দেখিবার সৌভাগ্য এবং বিশেষ করিয়া পাল্কী ধরিয়া ধরিয়া তাহার সহিত ছুটিয়া আসিবার গৌরব তাহাদের ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। বেহারারা মনে করিবে এক রত্তি ছেলেরা তাহাদের মত যোয়ানদের সঙ্গে পাল্লা দিতেছে, মনে মনে তারিফ করিবে এবং পাল্কী নামাইবা মাত্র যখন বধূ নামিবার পূর্ব্বেই তড়াক করিয়া পাল্কীতে ঢুকিয়া পড়িবে, তখন তাহারা কিচ্ছুটি বলিবে না এবং তাহা দেখিয়া হতভাগ্য সঙ্গীর দল দূরে দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিবে।

পাল্কী নামাইবা মাত্র মেয়েরা দরজার সামনে ভিড় করিল এবং অন্য দরজার সম্মুখে বালকগণের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল। সরমা ধীরে ধীরে পাল্কী হইতে নামিয়া রমণীব্যূহের পুরোভাগে দণ্ডায়মানা শাশুড়ীকে প্রণাম করিল, তারপর অপরাধিনীর মত নতমস্তকে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অপরাধ যে, এ বংশের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল কিন্তু হতভাগিনী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

শাশুড়ী অশ্রুহীন চক্ষে ক্রন্দনের ভঙ্গীতে কহিলেন, "কেঁদে কি করবে মা! মানুষের হাত ত' নাই। বেঁচে থাকলে আবার কত হবে। কিন্তু, কি শরীর করে এনেছ মা? তেমন ঢলঢলে চেহারা, নরম নরম গঠন যেন পোড়াকাঠ হয়ে গেছে; এ দেহ সেরে উঠতে এখন ছ'মাস লাগবে।

সরমা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণীবৃন্দের উদ্দেশ্যে শাশুড়ী কহিলেন, "বাপ নাই, মা ভাসুরের সংসারে রাঁধুনীবৃত্তি করে। কে দেখবে কেই বা ওষুধপথ্যি দেবে? আমি তাই কত্তাকে বলেছিলাম, যা হবার হয়েছে, ঘরের বউকে ঘরে নিয়ে এস, এখানে চিকিচ্ছেপত্তর করাই। ঘরে এত বড় ডাক্তার, এক শিশি ওষুধে বড় বড় রোগ সেরেছে, বউটা আর সারবে না? তা, কত্তার সেই এক কথা বেয়াইরা কি মনে করবে। তা, বৌমা ঘরে চল, এতখানি রাস্তা এসে মুখ শুকিয়ে গেছে।" বলিয়া হাঁক দিলেন, "ওলো শুভী!"

শুভী বাড়ীর দাসী। সে আসিলে শাশুড়ী কহিলেন, "বউমাকে ঘরে নিয়ে যা।"

বেহারাদের হুকুম দিলেন, "ওরে বেহারারা! জিনিষ-পত্তর কি আছে ঘরে ঢুকিয়ে দে দিকি।"

সরমা শুভীর সঙ্গে ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু মেয়েদের মজলিস চলিতে লাগিল। শাশুড়ী কহিতে লাগিলেন, "আজ-কালকার মেয়েদের সবই আলাদা যেমন খাওয়া-দাওয়া, তেমনি শরীর। যেন বাতাসে দুলছে। এক ছেলের মা হয়েই কোমর নিয়ে উঠতে পারেন না। আমাদের সময় এরকম ত' ছিল না। নইলে আমাকেই দেখ না, একটি আধটি নয় সাত সাতটি ছেলে পেটে ধরেছি মা। অবিশ্বি কাউকে কোলে রাখতে পারিনি, শেষে অনেক দেবতার দোর ধরে শকু আমার কোলজোড়া হয়ে থাকে। তা' আজকালকার কটা মেয়ের আমার মত শরীর বল দেখি? এত বড় সংসার একলা চালিয়ে এসেছি, কত্তাকে কোন দিন ঝি-চাকরের জন্য একটি পয়সা খরচ করতে হয় নি।"

সত্য, শরীর লইয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার শাশুড়ী ঠাকরুণের আছে। যেমন দৈর্ঘ্য, তেমনি প্রস্থ! কোমরের পরিধিও দেখিবার বস্তু!

শাশুড়ী ঠাকরুণ কহিতে লাগিলেন, "এই বউ নিয়ে কি করি মা? ও শরীর কি সারবে? একটি মাত্র ছেলে, কত সাধ ছিল নাতি-নাতনীর মুখ দেখব, তা' যদি একটা হ'ল তা রইল না। তার উপর বৌএর যে দশা হয়েছে, কত দিনে সেরে উঠবে কে জানে?" বলিয়া স্বখেদে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। শিশুর মৃত্যুর জন্য শাশুড়ী ঠাকরুণের দুঃখ নাই; বধূ যে প্রসব করিতে পারিয়াছে এইই ঢের। এখন এই পুত্র প্রসব করিবার যন্ত্রটি পাছে বিগড়াইয়া যায়, সেই জন্যই ভয়।

শ্বশুর রামতারণ চক্রবর্ত্তী। খাজনা আদায় করিবার জন্য ভোরে বাড়ীর বাহির হইয়াছিলেন; বৈকালে বাড়ী ঢুকিয়া হাঁক দিলেন, "গিন্নী।"

তাঁহার এক হাতে ঝুলিতেছে একটা প্রকাণ্ড লাউ এবং কাঁধের উপরে অতি প্রাচীন ছাতার প্রান্ত হইতে ঝুলিতেছে একটা প্রকাণ্ড পুঁটুলী। গিন্নী বাহির হইয়া আসিতেই চক্রবর্ত্তী লাউটা তাহার হাতে দিলেন এবং পুঁটুলীটা নামাইয়া ছাতাটা দিয়াই ঘর্ম্মাক্ত মুখটা মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর কাপড় জানুর উপর তুলিয়া হাত পা মেলিয়া মাটির উপরেই বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "হাত মুখ ধোবার একটু জল দাও দিকি। ওঃ! আজ সারাদিন কি হয়রানী গেছে। ব্যাটারা সব শয়তান! কেউ এক পয়সা দিলে না। সব এক কথা—কোথায় পাব, খেতে পাইনি। আরে ব্যাটারা, খেতে পাসনি ত' আমি কি করব? আমি কি খেতে

দেবার মালিক ? ধার করেই হোক, আমার খাজনা মিটিয়ে দে, তারপর সবাই মিলে ভগবান্‌কে ডাক। তা কি কেউ শোনে ? সব অধার্ম্মিক, দেব-দ্বিজে ভক্তি বিন্দুমাত্র নাই। আগে গেলে কেমন ভক্তি করত, কেউ না খাইয়ে ছাড়ত না। আজকাল তাড়াতে পারলে যেন বাঁচে। ঘোর কলি! ঘোর কলি!"

এক গাড়ু জল আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। পা ধুইতে ধুইতে চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেন, "এই লাউটা কি সহজে দিয়েছে না কি? কেড়ে আনতে হয়েছে। পরাণের বউ বলে, দেবতার নামে আছে। আরে মাগী! ব্রাহ্মণের বড় দেবতা কলিকালে আছে নাকি ? নিলাম পট করে ছিঁড়ে।"

পা ধোয়া হইলে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "ওরে ও শুভী! একটু তামাক দে দিকি।"

গিন্নী কাছে বসিয়া পাখা করিতে করিতে কহিলেন, "বৌমা এসেছে।" বলিতে বলিতে সরমা কাছে আসিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিল।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "এই যে মা, কখন এলে ? রোজ এক বার ভাবি, যাই একবার মাকে দেখে আসি। কিন্তু এমনি কাজের ঝঞ্ঝাট যে একদিনও অবসর হল না। এ্যাঁ! শরীরটা যে একেবারে গেছে দেখছি। তা' যাক, শকু আসুক একটা ওষুধপত্তর দিক্, দুদিনে সেরে যাবে এখন।"

ইতিমধ্যে শুভী তামাক দিয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আরাম করিয়া তামাক টানিতে টানিতে গৃহিণীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

রান্নাঘরের বারান্দায় সরমা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। ভাবিতেছে মায়ের কথা। মা তাহার এতক্ষণ কি করিতেছেন কে জানে। ভাবিতেছে তাহার স্বামীর কথা। কতদিন তাহাকে দেখে নাই! রোগশয্যায় কতদিন তাহার স্নেহস্পর্শের জন্য সর্ব্বদেহ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারে নাই! স্বামীও তেমনি! এতদিনের মধ্যে একদিন দেখিতে যাইবার সময় হইল না। এমন কি কাজ ? যদি সে না বাঁচত ? দুঃখ অভিমানে সরমার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। শ্বশুর ভুলিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু স্বামী, সে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিল!

বাউরী ঝি শুভী, ক্ষিপ্রপদে নিজের কাজ সারিতেছে। উঠান ঝাঁট দেওয়া হইল, গরু-বাছুরের রাত্রে আহারের জন্য একরাস খড় খস্ খস্ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বঁটিতে কাটিয়া ফেলিল; সংসারের সমস্ত বাসন-কোসন মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া আনিয়া

রান্নাঘরের বারান্দায় রাখিয়া সরমাকে কহিল, "বৌদিদি! জল দিয়ে ধুয়ে নাও।"

শুভী নীচ জাতি। তাহার ধোয়া বাসনের রান্নাঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। একবার একটুখানি জল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

শুভী নীচ জাতি হোক, কিন্তু তাহার রূপ দু'দণ্ড চাহিয়া দেখিবার মত। ইহার নিকষ কাল দেহে যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে। ভাদ্রের ভরা দীঘির মত, দেহ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রতি অঙ্গে—সুগঠিত বাহুতে, গুরু-নিতম্বে, পরিপুষ্ট বক্ষে কঠিন, নিটোল স্তনে, ঈষৎ-স্ফীত অধরোষ্ঠে, কাল চঞ্চল চোখে নব-যৌবন-শ্রী ঝলমল করিতেছে। মেয়েটা জানে, তাহার দেহে যৌবন-দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করে। তাই ক্ষণে ক্ষণে তাহার বক্ষ-বাস শ্লথ হয়; অকারণে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে; চোখ দুটী চমৎকার ভঙ্গীতে অর্দ্ধ-মুদ্রিত করিয়া আনমনা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; মনের আনন্দে মরালীর মত হেলিয়া, দুলিয়া হাঁটে।

শাশুড়ী ঠাকরুণ হাঁক দিয়া কহিলেন, "বাসনগুলো জল দিয়ে ঘরে তোল ত মা।" শুভীকে কহিলেন, "ওল ও শুভী, যাবার সময়ে মুড়ী নিয়ে যাস।"

সরমা বাসনগুলা জল দিয়া ধুইয়া ঘরে ঢুকাইয়া, বাহিরে আসিয়া দেখিল, শুভী খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া আছে।

সরমা কহিল, "বাড়ী যাবি না?"

ঠোঁট উল্টাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া, শুভী কহিল, "না, আজ যাব নাই। আজ থাকব তোমাদের ঘরে।" বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ব'স গো বৌদিদি, বস্‌লে চান করতে হবেক নাই।"

সরমা অনতিদূরে বসিল।

শুভী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আজ দাদাবাবু আসবেক নাই।"

সরমার মনটা চমকিয়া উঠিল, বলিতে চাহিল, "কি করে জানলি?" সামলাইয়া বলিল, "নাই বা এল; তোর দাদাবাবুর জন্য আমি মরে যাচ্ছি নাকি?"

শুভী আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দেখছিলাম তুমি কি কর। দাদাবাবু আসবেক রেতের বেলায়ঃ দিন আসে।"

শাশুড়ী ঠাকরুণ আবার হাঁক দিলেন, "ওলো, ও শুভী, মিছেমিছি রাত কচ্ছিস্ কেন ? মুড়ী নিয়ে বাড়ী যা।"

শুভী উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "বৌদিদির সঙ্গে গল্প করছি গো ঠাকরুণ।" সরমাকে কহিল, "আজ আসি বৌদিদি, কাল সকালে আবার আসব।" বলিয়া ঠক করিয়া মাথাটা মাটীতে ঠুকিয়া সরমাকে প্রণাম করিল।

সরমা কহিল, "ওকি ! প্রণাম করছিস্ কেন ?"

শুভী হাসিল, কহিল, "পেরণাম করব নাই ? তোমরা বামুন, দেবতা।"

মুড়ী লইয়া শুভী রোয়াকের কাছে একটা লঙ্কা গাছ হইতে কয়েকটা লঙ্কা ছিঁড়িতেই চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এই ! ও কী করছিস্ ? এই ভর সন্ধ্যেয় লঙ্কাগুলো ছিঁড়লি ? দেখি কতগুলো ছিঁড়লি—"

শুভী হস্ত প্রসারিত করিয়া চার পাঁচটা লঙ্কা দেখাইতেই, চক্রবর্ত্তী লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "গাছশুদ্ধ ফাঁক করে দিলি হতভাগী," বলিয়া তিন লম্ফে লঙ্কা গাছটার কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন। শুভী তখন ছুটিয়া দরজা পার হইয়া গিয়াছে।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "পুরন্ত লঙ্কাগুলো সব ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়েছে, ছুঁড়ী চোর ; আরও কি কি নিয়ে পালিয়েছে কে জানে ? চক্রবর্ত্তী উবু হইয়া বসিয়া গাছটিতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অনেক রাত্রে শশাঙ্ক বাড়ী ফিরিল। আজ কতকগুলা শক্ত রোগী হাতে ছিল, তাই দিনের বেলায় আসিবার সময় করিতে পারে নাই।

শাশুড়ী ঠাকরুণ কহিলেন, "বৌমা এসেছে। একেবারে মড়ার দশা হয়েছে। ভাল করে দেখে শুনে চিকিচ্ছে কর বাছা, নইলে বাঁচবেনা—"

বধূ-প্রসঙ্গ থামাইতে শশাঙ্ক কহিল, "বাবা কি শুয়েছেন ?"

মা কহিলেন, "আজ সারাদিন ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছেন। তাই চারটি খেয়ে নিয়েই শুয়েছেন। কেন, কোন দরকার আছে নাকি ?"

শশাঙ্ক কহিল, না, "এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।"

রাত্রে শাশুড়ী ঠাকরুণ শুইতে যাইবার পরে সরমা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। শশাঙ্ক খাটের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে সরমা মৃদুপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

শশাঙ্ক বিড়িটাতে শেষ টান দিয়া সেটি ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ওখানে দাঁড়ালে কেন? এখানে এসে বস।"

সরমা কাছে আসিয়া নত মুখে বসিল। শশাঙ্ক কহিল, "ইস্! একি চেহারা হয়েছে, একেবারে হাড়-কঙ্কাল সার হয়ে গেছ।"

সরমা মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তাতে তোমার আর কি? মরে গেলে আবার নতুন একজনকে আনবে।"

শশাঙ্ক কহিল, "ছিঃ ছিঃ, সে কী কথা", বলিয়া সরমাকে দুই হাত দিয়া কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল।

সরমা নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "থাক্ আর আদরে কাজ নাই। ভালবাসা তো কত! এত রোগে একদিন দেখতে যেতেও মনে পড়েনি। কাজের ভিড়; কাজ আর কেউ করে না তো! যদি মরে যেতাম"। বলিতে বলিতে সরমা কাঁদিয়া ফেলিল।

শশাঙ্ক কহিল, "পাগল! কান্না কেন?" বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া আনিল। আদর করিয়া মুখ মুছিয়া দিয়া কহিল, "আমার কি মন কেমন করে নি? কতদিন যাব ভেবেছি, তোমাদের গাঁয়ের কাছ পর্য্যন্ত গেছি, কিন্তু ফিরে এসেছি। তোমাদের বাড়ীর লোকগুলির সামনে যেতে আমার ভয় করে। কর্ত্তা, গিন্নী থেকে আরম্ভ করে ছোট ছেলেটি পর্য্যন্ত যেন গরবে মটমট করছে।"

ক্রমে সরমা শান্ত হইল; ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমি মরে যেতাম; একদিন এমন অবস্থা হয়েছিল। কোন জ্ঞান ছিল না, সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল।" ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "তুমি ভাবছিলে হতভাগী মরলেই বাঁচি—রূপ নাই, যৌবন নাই, বিশ্রী, কুৎসিত। নয়?"

শশাঙ্কের কোলে মাথা রাখিয়া, তাহার মুখে হাত দিয়া কহিল, "বল না গো সত্যি কি না?"

শশাঙ্ক প্রতিবাদ করিল না, নিঃশব্দে সরমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার জানলার পাশে দাঁড়াইয়া শুভী আড়ি পাতিয়া দেখিতেছিল; দেখিতেছিল না—সে যেন এই মিলন-দৃশ্য দুইচোখ দিয়া গিলিতেছিল! কক্ষের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ক্রমে স্তিমিত ও নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল; সে তখনও কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর, পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া

আসিয়া সামনের মাঠে উপুড় হইয়া পড়িয়া কি জানি কেন ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

৪

পরদিন শুভীর সহিত সরমার দেখা হইল পুকুর ঘাটে। একরাশ বাসন লইয়া শুভী মাজিতে বসিয়াছে। সরমাকে দেখিয়া শুভী উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাস্তা ছাড়িয়া দিল। সরমা কহিল—"কি লো শুভী, তোকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?" শুভী একবার মুখ নামাইল, তারপর সরমার মুখের পানে চাহিয়া ম্লান মুখে কহিল—"কাল রেতে গায়ে সুখ ছিল নাই বৌদিদি—" শুভী আবার বসিয়া পড়িয়া বাসন মাজিতে প্রবৃত্ত হইতেই, সরমা কহিল—"তবে কাজ করতে এসেছিস যে?—" শুভী শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল—"কাজে না এলে কি খাব দিদি! না কাজ করলে শুধু শুধু খেতে দিবে তুমরা?"

স্নান সমাপন করিয়া ফিরিবার পথে শুভী আবার উঠিয়া রাস্তার পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া হাসিয়া কহিল—"দাদাবাবুর সঙ্গে কাল রেতে ভাব হল?" সরমা হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ লো ছুঁড়ি! হয়েছে! ছুড়ী যেন কি!" বলিয়া প্রস্থান করিল। শুভী একদৃষ্টিতে অপস্রিয়মানা সরমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

দিন পনের পরে—একদিন অপরাহ্নে, উঠানের এক পাশে বেড়া দিয়া ঘেরা তরী-তরকারীর বাগানে, শুভী পুকুর হইতে কলসী ভরিয়া জল আনিয়া গাছে জল ঢালিতেছিল। এমন সময়ে চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আবার ঐ বেটীকে গাছের কাছে যেতে দিয়েছ! বেটী চোর, সেদিন লঙ্কা গাছটা সাবাড় করে দিয়ে গেছে, আজ আবার কি নিয়ে পালাবে কে জানে!" শুভীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"এই ছুঁড়ী! তোর গাছে জল দিয়ে কাজ নাই, অন্য কাজ করগে' যা—" নিজের মনেই কহিলেন—"চোখের সামনে যে পাঁচ পাঁচটা লঙ্কা ছিঁড়তে পারে, চোখের আড়ালে সে সব করতে পারে—বেটী আস্ত ডাকাত! শকুর যেমন কাণ্ড!"

চক্রবর্ত্তীর মধুর-ভাষী বলিয়া কখনও সুনাম নাই। এক গৃহিণী ছাড়া পৃথিবীর সকলকে তিনি চোর ও ডাকাত শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য—শুভীর

সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা উচ্চ ছিল না; সাধারণতঃ তাহাকে বলিতেন—চোর, এবং রাগ হইলে বলিতেন—'ডাকাত'। কিন্তু আগে কোনদিন শুভী রাগ করে নাই; চোর বলিয়া গালি দিলে সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিত; বস্ত্রাঞ্চল দিয়া হাসি চাপিয়া ডাগর চোখ অপরূপ ভঙ্গীতে ঘুরাইয়া বলিত—"কি চুরি করলাম গো কত্তাঠাকুর!" কর্ত্তাঠাকুরের রাগ বোধ করি জল হইয়া আসিত, তবু রাগতঃ স্বরে কহিতেন—"কি চুরি করলি যদি জানতেই পারি, তবেতো সেইদিনই তোকে ঘাড়ে ধরে বার করে দিই—"।

কিন্তু আজ শুভী রাগিয়া উঠিয়া, দুম করিয়া কলসীটা মাটীতে নামাইয়া দিয়া, রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিল। সরমা রাত্রির জন্য তরকারী কুটিতেছিল। শুভীকে কহিল—"কিলো! চলে এলি যে?" শুভী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"তুমাদের ঘরে আর কাজ করব নাই—বৌদিদি! রাতদিন বলবেক—চোর! কি চুরি করলাম আমি! দাদাবাবুকে বলে কাল আমি চলে যাব এখান থেকে—"। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ হইতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়িতে লাগিল। শুভী বলিতে লাগিল—"কয়লাখাদে আমার ঠাকুরজামাই কাজ করে, সেইখানেই যাব—"। সরমা কহিল—"দাদাবাবুই তোকে এখানে রেখেছে বুঝি?" শুভী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাই বটে। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল—"এখানে ত' ঘর লয় আমার, মামার ঘর। মামারা সব মরে গেছে, বেঁচে আছে শুধু বুড়ী ঠাকুরদিদি। দাদাবাবুই আমার সোয়ামীর চিকিচ্ছে করেছিল। সোয়ামী মরলে দাদাবাবু বললেক—তোর তো এ গাঁয়ে কেউ নাই; কোথায় থাকবি? চল্ আমাদের গাঁয়ে; আমাদের ঘরে কাজ করবি—আর থাকবি। আমার ঠাকুর-জামাই চিঠি নিখেছিল—কয়লাখাদে কাজ করতে যেতে। অতদূর যেতে মনটা কেমন করতে লাগল—তাই চলে এলাম এখানে—"

সরমা কহিল—"তোদের তো বিধবারা আবার বিয়ে করে। আবার বিয়ে কর—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবি—"। ঘাড় নাড়িয়া শুভী কহিল—"আর বিয়ে করব নাই—"। ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল—"সুখ তো কত!" বলিতে লাগিল—"আর এখানে রইব নাই আমি—দেশ ছেড়ে চলে যাব, ভাল লোক রাখবে তুমরা—"। বলিতে বলিতে আবার ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এ কয়দিন সরমার শরীর অনেকটা সারিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আজ সন্ধ্যার

পর হঠাৎ 'শীত-শীত' করিয়া জ্বর আসিল। শাশুড়ী কহিলেন—"তোমার আর বসে থেকে কাজ নাই, মা। শকু কতরাত্রে আসবে; তুমি শোওগে' যাও—"। সরমা শয়ন কক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ তাহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। শুভীকে তাহা হইলে শশাঙ্কই এখানে আনিয়াছে। এই মেয়েটার উপর এত দরদ কেন? তাহার স্বামীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়াছে, আবার পাছে একা কষ্ট হয় বলিয়া বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছে। আরও তো এমনই কত রোগী মরিয়াছে, তাহাদের বিধবাদের উপর স্বামীর এত মমতার কথা তো সে কখনও শুনে নাই। মা-বাপও তেমনই! ছেলের চোখের সামনে একটা যুবতী মেয়েকে দিনরাত রাখিতে রাজী হইলেন কিরূপে? আদুরে ছেলে! তা'ই বলিয়া তাহার সব আবদার রাখিতে হইবে নাকি! শশাঙ্কের সহিত আজ সে বোঝা-পড়া করিবে।

মাথার মধ্যে অসহ্য ব্যথা। সর্ব্বাঙ্গ যেন খসিয়া পড়িতেছে। সরমা কখন ঘুমাইয়া পড়িল জানে না। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল—কক্ষ অন্ধকার; তেলের প্রদীপটা কখন নিভিয়া গিয়াছে; সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজা, এবং দারুণ পিপাসায় বুকের ভিতরটা কাঠ হইয়া উঠিয়াছে; ঘরের দরজা খোলা; শশাঙ্ক এখনও আসে নাই।

অতিকষ্টে বিছানা হইতে উঠিয়া, সরমা টলিতে টলিতে বাহিরে আসিল। স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় সারা বারান্দা ও উঠান ভরিয়া গিয়াছে। কলস হইতে জল লইয়া পান করিয়া সরমা সেইখানেই বসিয়া পড়িল। ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। সরমার সর্ব্বদেহ জুড়াইয়া গেল; মনে হইল, বারান্দার মেজের উপর খানিকক্ষণ শুইয়া থাকে। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল—সদর দরজা খোলা রহিয়াছে। শাশুড়ীর যেমন কাণ্ড! দরজা খুলিয়া রাখিয়া বেশ নিশ্চিন্তে শুইয়া পড়িয়াছেন! সকালে দেখিয়া শ্বশুর সারা বাড়ী মাথায় করিবেন; কি চুরি গিয়াছে দেখিবার জন্য বাক্স, প্যাঁটরা, বিছানা, মায় রান্নাঘরের হাঁড়ি-কুঁড়ি পর্য্যন্ত তল্লাস করিবেন; সমস্তদিন গালাগালির সীমা থাকিবে না। সরমা সদর দরজা বন্ধ করিতে চলিল।

দরজার কাছে আসিয়াই সরমা থমকিয়া দাঁড়াইল। কে এতরাত্রে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে! দরজার বাম পাশে একটা খড়ের চালা-ওয়ালা লম্বা ঘর—

তাহাতে দুইটা কুঠুরী ; একটাতে বাহিরের কেহ আসিলে বসিতে দেওয়া হয়, আর একটাতে গোয়াল। কান্নার শব্দটা সেই দিক হইতেই আসিতেছে বোধ হইল। সরমার একবার মনে হইল—হয়তো কোন প্রেতিনী কাঁদিতেছে ; এই গভীর নিশীথে নির্জ্জন পল্লী-পথে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া প্রিয়জনকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। মনে হইতেই, সরমার বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিতে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সন্ধ্যায় যে অস্পষ্ট সন্দেহ তাহার কানে কানে গুঞ্জন করিয়াছিল, এক্ষণে সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া একটি নিদারুণ মর্ম্মান্তিক সত্যকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। সরমা দরজার বাহিরে আসিল। পাশে দেওয়াল ; কিছুই দেখা যায় না। সরমা ধীর পদে অগ্রসর হইল। দেওয়াল পার হইতেই দেখিল, গোয়াল ঘরের সামনে শশাঙ্ক দাঁড়াইয়া আছে, আর, তাহার পায়ের নীচে মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছে শুভী। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত সরমার সর্ব্বদেহ ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল ; মাথার মধ্যে যেন ঝমাঝম্‌ করিয়া করতাল বাজিতে লাগিল ; পা দুইটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি রহিল না। সরমা দেওয়াল ধরিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। একবার মনে হইল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সকলকে ডাকিয়া জড় করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল—ছিঃ ছিঃ এ দুর্ভাগ্য কাহাকেও দেখাইতে আছে! কুৎসিত ব্যাধির মত ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে ইহার জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। পলে পলে জীবন ক্ষয় হইয়া আসিবে, তবু ইহার কোন প্রতিকার করা চলিবে না।

শুভী শশাঙ্কর পায়ে মাথা রাখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে—"কি দোষ করেছি আমি ; একদিন একটি বারও কথা কও নাই, আমার দিকে চা'ও নাই, একবার ডাক নাই। এমন করলে আমি কি করে থাকব? আমি চলে যাব। তুমি একবার বল—তুই চলে যা'—আমি এখনই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি ; আর কখনও তোমার সামনে আসব নাই—"। শশাঙ্কর পায়ে মাথা গুঁজিয়া শুভী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুইহাত দিয়া শশাঙ্কর পা দুইটী জড়াইয়া উর্দ্ধমুখে কহিল—"তোমাকে না দেখলে যে আমি থাকতে নারি। তোমাকে ছাড়লে আমি বাঁচব নাই—"। শশাঙ্ক তাহাকে দুইহাত দিয়া তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল—"কাল যাব তোর কাছে—"।

শুভী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া কহিল—"না আজ আমি তোমাকে ছাড়ব নাই—"।

প্রচণ্ড অগ্নিদাহে যাহার সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, প্রতিকারের কোন উপায় নাই, সে যেমন নির্লিপ্ত বৈরাগ্যে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সর্ব্বগ্রাসী লেলিহান অগ্নিশিখার পানে তাকাইয়া থাকে, ঠিক তেমনই ভাবে সরমা এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। একবার তাহার মনে হইল—তাহার সহিত ইহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই, সে যেন অভিনয় দেখিতেছে। কিন্তু শশাঙ্ক যা'ই শুভীকে দুইহাতে তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিল, তা'ই তাহার মনে হইল, কে যেন উত্তপ্ত সাঁড়াসি দিয়া মাথার মধ্যে একটা শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া দিল। তীব্র বেদনায় অস্ফুট কণ্ঠে 'মাগো' বলিয়া সরমা সংজ্ঞাহীন হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

সংজ্ঞালাভ করিয়া সরমা দেখিল—শশাঙ্ক চলিয়া গিয়াছে। সরমা উঠিয়া দাঁড়াইল; স্খলিত বসনাঞ্চল একহাতে ধরিয়া, টলিয়া টলিয়া পথের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। চক্ষের সম্মুখে জনশূন্য, শব্দশূন্য, দিগন্তব্যাপী প্রান্তর নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। শুধু তাহারই চোখের ঘুম কে কাড়িয়া লইয়া বুকে অনির্ব্বাণ চিতা জ্বালাইয়া দিল! পৃথিবীতে তাহার আর আপনার বলিতে কিছুই রহিল না। এর চেয়ে সে মরিল না কেন? যে ক্রন্দনস্রোত এতক্ষণ জমাট হইয়া ছিল, হঠাৎ গলিয়া গিয়া দুই চোখ হইতে হু হু করিয়া ঝরিতে লাগিল। সেই ধূলিময় পথের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া সরমা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল "মাগো! কেন আমাকে মরতে দিলে না? এই দেখবার জন্যে বাঁচালে! আর যে সইতে পারছিনা মা!"

তার পরদিন অনেক রাত্রে শশাঙ্ক বাড়ী আসিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল আসিস নি যে?" শশাঙ্ক কহিল—"কাল রাত্রে আর ফিরতে পারলাম না। একটা ডেলিভারী কেস ছিল। সমস্ত রাত্রি কি পরিশ্রম গেছে। প্রসব হ'তে সকাল আটটা হ'য়ে গেল, বাড়ী না ফিরে তাই সোজাসুজি ডিসপেন্সারীতে ফিরে গেলাম।"

সরমা শুনিল। সারাদিন তাহার জ্বর ছাড়ে নাই। শয়ন কক্ষে মেজেতে মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। সে স্থির করিয়াছে, স্বামীকে কিছু বলিবে না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করিবে, রূপ ও যৌবন তোমার সব হইল? অপরিস্ফুট

কৈশোর ও বিকশিত যৌবনে নারী-হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা তোমার পায়ে উজাড় করিয়া দিয়া যে ভিখারিণী সাজিয়াছে, তাহার কোন মূল্য নাই? নিষ্ঠুর দেবতার মত নিত্য নব-বিকশিত অম্লান পুষ্পের পূজা লইতে চাও? তোমার চরণের তপ্ত স্পর্শে যে ফুল চরণেই শুকাইল তাহাকে অবহেলায় ধূলায় ফেলিয়া দিবে? সরমা পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—সে কাঁদিবে না, কিন্তু প্রতিবারই সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সরমা নিঃশব্দে কাঁদিয়াছে; বলিয়াছে—"ইহার জন্যই এতদিন আমাকে মনে পড়ে নাই, মরিতে বসিয়াছি সংবাদ পাইয়াও একদিন দেখিতে যাইবার সময় পাও নাই; মিথ্যা স্তোক দিয়া বুদ্ধিহীনাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছ।"

শাশুড়ী ছেলেকে বলিলেন—"বৌ এর আবার জ্বর হয়েছে। এখনও ছাড়ে নাই। সারাদিন চোখ মেলে চায় নাই। একবার ভাল করে দেখ। বেশ ক'দিন ভাল ছিল, আবার কি যে হ'ল! যদি বলিস বাড়ীর ওষুধে সারবে না, তবে না—হয় শ্যাম কবরেজকে দেখাই।"

শ্যাম কবিরাজ এ অঞ্চলে খ্যাতনামা চিকিৎসক। শশাঙ্ক কহিল—"এতদিনের রোগ কি এত শীগগির সারে? দু'দিন সবুর কর। সেরে যাবে এখন।" অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া কহিল—"শ্যাম কবরেজ বেটা চিকিৎসার জানে কি? কটা ওষুধ আছে তার যে চিকিৎসা করবে? লোক ঠকিয়ে এতদিন খাচ্ছে বৈ ত নয়।"

সকলে শুইতে যাইবার অনেক পরে শশাঙ্ক শয়ন কক্ষে ঢুকিল। সরমা একটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া শশাঙ্ক বলিয়া উঠিল—"এমন করে মেজেতে পড়ে থাকলে জ্বর ছাড়বে কি করে?"

তারপর সরমার পাশে বসিয়া কহিল—"শুনছ? খাটের উপর উঠে শোও।" বলিয়া মুখের আবরণ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। সরমা শশাঙ্কের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া সর্ব্বাঙ্গ আবার ভাল করিয়া আবৃত করিল।

শশাঙ্ক কহিল—"ও কী হচ্ছে! রাগ করেছ না কী? কাল শক্ত একটা কেস হাতে ছিল, ডেলিভারী কেস, তাই আসতে পারিনি। রাগ কোরোনা লক্ষ্মীটি।" বলিয়া শশাঙ্ক সরমাকে পাশ ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু সরমা সেই যে ওপাশ ফিরিয়া শুইল, আর কোন ক্রমেই তাহাকে এপাশে ফিরান গেল না। বহু সাধ্য সাধনা করিয়া অবশেষে শশাঙ্ক কহিল—

'ভারী মুস্কিল ত'! কাল এখানে আসবার জন্য বেরিয়েছি, এমন সময়ে রাধানগর থেকে একজন লোক এসে হাজির। বলে এখনই যেতে হবে; তিন দিন ধরে তার মেয়ের প্রসব যন্ত্রণা হচ্ছে, এক মিনিট দেরী করা চলবে না। আমি বললাম, আরে মশায়, আমার বাড়ীতে স্ত্রীর অসুখ; আমার মন ছটফট করছে। লোকটা আমার পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কি করি, যেতে হলো। সমস্ত রাত যমে মানুষে টানাটানি, শেষকালে প্রসব হোলো। তোমার না বিশ্বেস হয়তো লোক পাঠিয়ে খবর নাও।

শশাঙ্কর এই মিথ্যাচার দেখিয়া সরমার মনে হইল—এ কখনও তাহাকে ভালবাসে নাই। তাহার অকৃত্রিম প্রাণঢালা ভালবাসার বিনিময়ে চিরদিন ভালবাসার ভান করিয়াছে, মিথ্যা বলিয়া চিরদিন তাহাকে ঠকাইয়াছে। সহসা নিদারুণ রোষ ও অভিমান তাহার মনের মধ্যে দাবাগ্নির মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; দুইহাতে চাদরটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, দুই চক্ষে আগুন জ্বালাইয়া তীক্ষ্ণ, অনুচ্চকণ্ঠে কহিল— "তুমি মিথ্যাবাদী। চিরদিন মিথ্যা বলে ভুলিয়েছ; আজ আবার তাই ভোলাতে এসেছ। আমি নিজের চোখে সব দেখেছি। আর ভুলব না। কাল রাতে কোন্ রোগীর বাড়ীতে ছিলে? কাল রাতে কাকে বুকে করে দাঁড়িয়ে ছিলে? আমি কিছুই দেখিনি মনে করেছ? একটা ছোটলোকের মেয়েকে ছুঁয়ে এসে, ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না?"

সরমার এরূপ রোষদীপ্ত মূর্ত্তি শশাঙ্ক কখনও দেখে নাই। তাহার এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখিয়া শশাঙ্ক ভয় পাইয়া কহিল—"আরে! চুপ, চুপ! কাকে না কাকে দেখে তুমি মিছেমিছি রাগ করেছ! পাশের ঘরে বাবা-মা রয়েছেন। তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেল নাকি?"

সরমা বলিতে লাগিল—"যাও, আমাকে আর বেশী বকিও না। যেখানে ভাল লাগে সেখানে যাও। আমার কাছে আর মুখ দেখিও না। আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। এ ক'টা দিন সবুর কর। তারপর যা'কে ইচ্ছে ঘরে নিয়ে এসে সুখে স্বচ্ছন্দে থেক।" বলিয়া সরমা আবার শুইয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ চাদর দিয়া আবৃত করিল।

শশাঙ্ক কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সরমার মনে হইল—শশাঙ্ক যেন চিরজন্মের মত তাহার

জীবন হইতে চলিয়া গেল; আর বোধ হয় তাহার সহিত দেখা হইবে না। একবার সে উঠিয়া বসিল; ভাবিল তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনে; পর মুহূর্ত্তেই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল।

৫

পরদিন সকালে পুকুর হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেই শাশুড়ী দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন, "এ কী মা! চান করলে যে? কাল সারা দিনরাত জ্বরে গা পুড়ে গেছে; আজও মুখ চোখ থম থম করছে। এতে চান করা ভাল হয়নি, মা। এমন করলে সারবে কি করে?"

সরমা কহিল, "আমার জ্বর ছাড়বে না মা। কতদিন আর শুকিয়ে শুকিয়ে থাকব, যতদিন বাঁচি, নেয়ে খেয়ে নি।"

শাশুড়ী কহিলেন, "কি যে ছেলে মানুষের মত কথা বল বৌমা। রোগ সারবে না, একী অলক্ষুণে কথা! রোগ কি কারও হয় নি? দু দিন সাবধানে থাক, ওষুধপত্তর ভাল করে খাও, রোগ সারতে পথ পাবে না।"

সরমা আর কোন কথা কহিল না।

কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কথা অনুযায়ী সাবধানেও সে থাকিল না। নিত্য জ্বর আসে, তবু উঠিয়া বসিয়া সংসারের কাজ করে, স্নান আহার করে। শাশুড়ী নিষেধ করিলেও কাণ দেয় না। বলে, "নাইতে খেতেই সারবে মা; আপনি এত ভাবছেন কেন?"

একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, "ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগ্যের ঘোড়া মরে। বউ তো মরলেই ভাল মা। আবার নূতন সুন্দরী বৌ আসবে।"

শাশুড়ী আশ্চর্য্য হইয়া যান। যে বউ এর মুখে কথাটি ফুটিত না, সে আজকাল কথায় কথায় জবাব দেয়, ঠেস দিয়া কথা বলে। শাশুড়ী কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "বৌমা! আমার দিকে তাকাও দেখি?"

সরমা মুখ তুলিয়া কহিল, "কেন মা?"

শাশুড়ী কহিলেন, "শকু কি তোমায় কিছু বলেছে?"

সরমা মুখ নীচু করিল, তাহার চোখে জল আসিতে চায়। শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "না মা"।

শাশুড়ীর কেমন যেন সন্দেহ হইল। শশাঙ্ক কয়দিন বাড়ী আসে নাই। বলিয়া পাঠাইয়াছে, ভারী রোগীর ভিড়, রাত্রে বাড়ী আসিতে পারিবে না। বউমারও যেন কেমন ভাব! কে জানে ইহাদের কি হইয়াছে!

এদিকে সরমার জীবনধারা দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে; উঠিতে বসিতে কষ্ট হয়। আজকাল প্রত্যেক দিন অপরাহ্লে জ্বর আসে, সমস্ত রাত্রি কোন হুঁস্ থাকে না। শাশুড়ী একদিন চক্রবর্ত্তীকে কহিলেন, "শুনছ! বৌমার অবস্থা কেমন আমার ভাল মনে হচ্ছে না। জ্বর তো ছাড়ছেই না, তা ছাড়া দিন দিন নেতিয়ে পড়ছে। তুমি একবার শ্যাম কবরেজকে দেখাও বাপু।"

চক্রবর্ত্তী বারান্দায় একটা কম্বলে বসিয়া মনোযোগ সহকারে বৈষয়িক হিসাবপত্র দেখিতেছিলেন। গৃহিণীর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "শ্যাম কবরেজ কেন? শকুর ওষুধে দেশ-বিদেশের লোক সারছে, আর ঘরের বৌটা সারবে না, চালাকি না কি?" তারপর হাতের কাগজটা নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন "দেখ গিন্নী! এত নবাবী ভাল নয়। যা রয় সয় তাই করতে হয়। শ্যাম কবরেজকে আনতে এখনই আটটি গণ্ডা পয়সা লাগবে। আসবে কোত্থেকে শুনি?"

গিন্নী কর্ত্তার ধাত জানিতেন, বলিলেন, "তা লাগুক পয়সা, তবু ঘরের বৌএর চিকিচ্ছে করবে না? লোক বলবে কি?"

গিন্নীর কথা শেষ হইতে না হইতেই চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "চিকিচ্ছে করাই না? ঘরে এত বড় ডাক্তার, তবু চিকিচ্ছে হচ্ছে না। লোক কিছু বলুক আর না বলুক, তুমিই বলাবে দেখছি।"

গিন্নী কহিলেন, "বাড়ীর ডাক্তারের ঔষুধে বাড়ীর লোকের ফল হয় না। না হলে আজ দু মাস হয়ে গেল, বৌ-এর সারবার তো কিছুই দেখছি না। হয় চিকিচ্ছের ব্যবস্থা কর, না হয় বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। চোখের সামনে মেয়েটা মরে যাবে, তা' দেখতে পারব না বাপু!"

চক্রবর্ত্তী মহা বিপদ গণিলেন। আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, "বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া মন্দ যুক্তি নয়। তবে, এই তো সেদিন এসেছে, তারাই বা মনে করবে কি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি শ্যাম কবরেজের কাছে।"

দুপুর বেলায় চক্রবর্ত্তী গৃহে ফিরিয়া হাঁক দিলেন, "গিন্নী!"

এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া গিন্নীর সমীপে গিয়া কহিলেন, "গিছলাম শ্যাম কবরেজের কাছে। এই দেখ ব্যবস্থা করে এনেছি।" তাঁহার হাতে একখণ্ড লম্বা কাগজের টুকরা, তাহাতে কি কতকগুলা লেখা। সেই কাগজটা গিন্নীর সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, "এই দেখ।"

গিন্নী লেখা-পড়া জানেন না, তবু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বেশ।" চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "পাঁচনের ফর্দ্দ; অব্যর্থ পাঁচন, পৃথিবীতে এমন রোগ নাই যে এই পাঁচনে সারবে না। অথচ খরচ নাই। দেখ না, আমি সব যোগাড় করে আনছি।"

অব্যর্থ পাঁচন ব্যর্থ হইল। অবশেষে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পরে চক্রবর্ত্তী শ্যাম কবিরাজকে সরজমীনে ডাকিয়া আনিলেন।

শ্যাম কবিরাজের বয়স বোধ করি ষাটের কাছাকাছি। বেঁটে ও রোগা। গায়ে একটি ফতুয়া এবং পায়ে স্বদেশী চটি। দাড়ি ও গোঁফ দুইই কামাইয়া থাকেন, কিন্তু বোধ হয় অনেক দিন নাপিতের সাক্ষাৎ পান নাই; খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে সমস্ত মুখমণ্ডল কণ্টকাকীর্ণ। মাথার চুলগুলি সব পাকা ও চারিদিকে সমান করিয়া ছাঁটা। মস্তকের কেন্দ্রদেশে একটি ইঞ্চিখানেক লম্বা পরিপুষ্ট শিখা, খাড়া দণ্ডায়মান।

শ্যাম কবিরাজকে বসিতে বলিয়াই চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "বসুন, এখনই আসছি।" মিনিট পনের পরে ফিরিলেন। তাঁহার পশ্চাতে শুভী, তাহার মাথায় এক বোঝা আগাছা। শুভী সেইগুলি কবিরাজের সম্মুখে নামাইল, চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "এই গুলো সব বাড়ীর পাশে হয়েছে। দেখুন দিকি, এগুলো আপনার ওষুধে লাগবে কি না।"

কবিরাজ হাসিয়া কহিলেন, "আপনি পাগল হয়েছেন চক্রবর্ত্তী মশায়, যা'-তা' গাছগাছড়া কি ঔষধে লাগে? সে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়।"

চক্রবর্ত্তী দমিয়া গেলেন; শুভীকে সেই আগাছার স্তূপ সরাইতে বলিয়া কহিলেন, "না—তাই—দেখছিলাম, যদি লেগে যায়। তা হলে ওষুধের দামটা একটু কাটান হয়ে যেত আর কি।"

রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ গম্ভীর ভাবে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া চক্রবর্ত্তী ভড়কাইয়া গেলেন। কাছে বসিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিলেন, "কেমন দেখলেন?"

কবিরাজ চোখ দুইটা বুজিয়া, ঠোঁট ডুমড়াইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "সুবিধে নয়। বৌমার ক্ষয়রোগ হয়েছে। শিবের অসাধ্য রোগ। তবে চেষ্টা করে দেখতে হবে।"

চক্রবর্ত্তীর মুখটা শুকাইয়া ছাইয়ের মত হইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া কহিলেন, "যক্ষ্মা! কতদিন হয়েছে?"

কবিরাজ কহিলেন, "তা' হয়েছে অনেক দিন। এখন তো শেষ অবস্থা।"

চক্রবর্ত্তী আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "বলেন কি? তবে তো বাড়ীর সকলের হতে পারে? আমারও তো হতে পারে?"

কবিরাজ মহাশয় মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "হতেও পারে আর না হতেও পারে। সব ভগবানের হাত। তবে আপনি বৌমাকে গৃহান্তরিত করুন।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "গৃহান্তরিত কেন, স্থানান্তরিত করছি। বেয়াইকে আজই চিঠি দিচ্ছি। কিন্তু, ভারী ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি; আমি এখন কি করি?"

হঠাৎ হাতটা কবিরাজের দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "আমার হাতটা দেখুন দিকি কবরেজ মশায়, জ্বরটর ঠেকছে কি না। গলাটাও কদিন থেকে খুস খুস করছে।" বলিয়া কাসিলেন।

কবিরাজ মহাশয় চক্রবর্ত্তীর নাড়ী দেখিয়া কহিলেন, "আপনার কিছু হয় নি। কেন এত ভয় পাচ্ছেন? আর যদি হয়ই মশায়, তো ভয় করে কি করবেন? মরতে তো একদিন হবেই।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "আপনি তো বেশ বলছেন মশায়, মরতে তো হবেই। মরা এমনি সোজা কথা কি না! আপনার অব্যর্থ পাঁচনটা দেখছি আমাকেই খেতে হবে!"

কবিরাজকে বিদায় দিয়া চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর কাছে আসিয়া কহিলেন, "শুনেছ?"

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, তিনি কিছুই শুনেন নাই এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "কি গো?"

চক্রবর্ত্তী দুই হাতের তর্জ্জনী দ্বারা বুকটা ঠুকিয়া চাপা গলায় কহিলেন, "যক্ষ্মা, বৌমার যক্ষ্মা হয়েছে। আজ নয়, অনেক দিন। শিবের অসাধ্য রোগ, বাঁচবার আশা নাই। দু এক মাসের মধ্যেই—"

গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "সে কি গো! আমার এমন সোনার বৌ।"

চক্রবর্ত্তী ধমক দিয়া কহিলেন, "সোনার বৌএর জন্যে কেঁদে লাভ নাই। বেঁচে থাকলে সোনার বৌ এনে দেব। এখন ওকে ঘর থেকে বিদেয় কর দেখি। বিষাক্ত রোগ, ঘরে রাখা চলবে না, কবরেজ বলছে।"

গালে হাত দিয়া বিস্মিত কণ্ঠে গৃহিণী কহিলেন, "সে কি গো? ঘরের বৌকে কোথায় বিদেয় করবে? রোগ আর কার বাড়ীতে হয় না? কে-ই বা নীরোগ?"

চক্রবর্ত্তী বাধা দিয়া কহিলেন, "যে সে রোগ নয় গিন্নী, যক্ষ্মা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে হু হু করে বিষ বেরুচ্ছে।"

গৃহিণী কহিলেন, "তা' বলে ঘর থেকে বিদেয় করে দিতে হবে? রোগে শোকে না দেখলে তো আপনার লোক কিসের জন্যে? যদি আমার হয়? যদি তোমার—" কথা শেষ করিতে হইল না।

চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন, "কি যে অলক্ষুণে কথা বল গিন্নী। যদি তোমার হয়, যদি আমার হয়,...হওয়াটা খুব মজার, না? শিবের অসাধ্যি রোগ হলেই একেবারে"...বলিয়া ঘাড় হেলাইয়া, চোখ বুজিয়া জিভ বাহির করিলেন, তাঁহার হাত দুইটা সটান লম্বা হইয়া দেহের দুই পাশে ঝুলিতে লাগিল। তারপর গৃহিণীর পাশে উবু হইয়া বসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "তুমি ভারী অবুঝ গিন্নী। বিদেয় মানে কি একেবারে মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে আসা? তা নয়। মানে ওকে বৈঠকখানা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যতদিন না ওর বাপের বাড়ী যাওয়া হয়। আজই বেয়াইকে আমি খবর দিচ্ছি।"

গৃহিণী অনেকটা শান্ত হইলেন, তবু আর একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিলেন, "বৈঠকখানা ঘরে একলা ছেলেমানুষ থাকতে পারবে?"

"আমি একলা থাকতে পারব মা।" উত্তর দিল সরমা।

ইতিমধ্যে কখন সে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাটীর উপরেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, "আমার জন্যে তোমরা কেন বিপদে পড়বে মা?"

কর্ত্তা ও গিন্নী চমকিয়া উঠিয়া একসঙ্গে সরমার পানে তাকাইলেন। দেওয়াল ঠেস দিয়া সরমা বসিয়া আছে; মাথায় কাপড় নাই, রুক্ষ চুলগুলা কপালে ও মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। গায়ের কাপড় এলোমেলো। ক্লান্ত চোখ দুটি সুদূর আকাশের পানে নিবদ্ধ। সংসারের সঙ্গে এই মেয়েটির দেনা-পাওনা যেন ফুরাইয়া

গিয়াছে, তাই ইহার শীর্ণ মুখে দৃঢ়-নিবদ্ধ অধরৌষ্ঠে ফুটিয়া উঠিতেছে একটি নির্লিপ্ত অবহেলা, কণ্ঠস্বরে ধ্বনিতেছে কামনাহীন নীরস বৈরাগ্যের সুর।

সরমা কহিতে লাগিল, "বাপের বাড়ী আমাকে পাঠিও না মা। তাদেরও তো ছেলেপিলের সংসার। তারাই বা আমাকে নেবে কেন? যে ক'দিন বাঁচি, এখানেই কোথাও পড়ে থাকতে দিও।"

শাশুড়ী নিরর্থক বহুদিনের অভ্যাস মত কহিলেন, "সে কী মা!"

চক্রবর্ত্তী চুপ করিয়া থাকিয়া সরমা ও গৃহিণীর পানে তাকাইয়া কহিলেন, "আমি আসছি।" বলিয়া দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিলেন। বাতাস যেরূপ অনুকূল ভাবে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর হাল ধরিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।

সরমা তখন তাহার দেহ হইতে একে একে স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। শাশুড়ী একবার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সরমা কহিল, "আর কেন মা? তোমাদের জিনিস তোমরা দেখে শুনে নাও।"

চক্রবর্ত্তী তখন হাঁক-ডাক দিয়া বৈঠকখানা ঘরটা ঝাঁট দেওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই শুভীকে সঙ্গে করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিন্নীকে ডাকিয়া কহিলেন, "কই গো বৌমার বিছানাগুলো বার করে দাও দিকি? সব ঠিক করে দিয়ে এসেছি, বৌমার কিছু কষ্ট হবে না। আর ওটাও তো ঘর—"।

সরমা শাশুড়ীর পানে তাকাইয়া নীরস কণ্ঠে কহিল, "বিছানার কোন দরকার নাই মা। একটা ছেঁড়া কম্বল আছে তো দাও। কদিনের জন্যই বা! এ সব তো সঙ্গে যাবে। ভাল জিনিস তোমাদের নষ্ট করে লাভ কি মা?"

চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিলেন, "বৌমা ঠিক বলেছেন। কি বুদ্ধি! সত্যি তো বিছানাগুলো—দেখি একটা কম্বল টম্বল।" বলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বোধ করি ছেঁড়া কম্বলের খোঁজ করিতে লাগিলেন।

ছেঁড়া কম্বল জুটিল না, জুটিল একটা ছেঁড়া মাদুর আর একটা ময়লা বালিশ। শুভী সেগুলি বগলদাবা করিয়া বাহিরে লইয়া চলিল এবং চক্রবর্ত্তী তদ্বির করিবার জন্য তাহার অনুগমন করিলেন।

সরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শাশুড়ীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "তোমার

সংসার হতে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি মা। দোষ অপরাধ অনেক করেছি, সে সব ক্ষমা করে আশীর্ব্বাদ কর যেন বেশীদিন এ যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়।"

শাশুড়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বৌমা আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কি করব মা। আমার কোন হাত নাই।"

সরমা শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "তুমি কি করবে মা? আমার অদৃষ্ট।"

দশ দিন পরে একদিন অপরাহ্নে চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিলেন। তাঁহার হাতে একখানি চিঠি।

"বেটারা জোচ্চোর! ডাকাত! আমাকে বিপদে ফেলে সব এখন সরে পড়বার চেষ্টা।"

গৃহিণী রান্নাঘরে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কি হ'ল গো?"

চক্রবর্ত্তী হাঁক দিয়া কহিলেন, "হ'ল তোমার মাথা আর আমার মুণ্ড। তোমার পেয়ারের বেয়াইরা এ্যাদ্দিন পরে চিঠির জবাব দিয়েছেন।"

গৃহিণী কহিলেন, "বৌমাকে নিয়ে যাবে নাকি?"

চক্রবর্ত্তী রোষ-কষায়িত লোচনে গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, নিয়ে যাবে বৈ কি! তেমনি লোক কিনা।" বলিয়া কোমরে দুই হাত দিয়া সামনে পদচারণা করিতে লাগিলেন। বার কয়েক ঘুরিয়া একেবারে সটান রান্নাঘরে আসিয়া দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া গৃহিণীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, "কি করা যায় বল দেখি?"

গৃহিণী কহিলেন, "কিসের?"

চক্রবর্ত্তী ধমকাইয়া উঠিলেন, "আমার শ্রাদ্ধের। বুঝতে পার না কেন?"

গৃহিণী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

চক্রবর্ত্তী চোখ পাকাইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "চলে যাচ্ছ যে বড়?"

গৃহিণী থামিয়া কহিলেন, "কি করব? কিছু বলবে না। কেবল ধমক। অত ধমক শুনবার আমার সময়ও নাই, ইচ্ছাও নাই।"

চক্রবর্ত্তী নরম হইয়া কহিলেন, "জোচ্চোর বেটারা আমার মাথা গরম করে দিয়েছে গিন্নী। কি লিখেছে জান? ছেলেপিলের সংসার, ওরকম রোগীর থাকবার সুবিধে হবে না। এখন এই রোগী নিয়ে আমি কি করি বল দেখি? মরবে ত

ও নিশ্চয়ই। কিন্তু মরবার পর দমকা এক থোক খরচ, কাঠ রে, কয়লা রে, তারপর শ্রাদ্ধ, তায় এক গাদা খরচ। না করলেও বিপত্তি। ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবে। এ ত' এক মহাবিপদে পড়লাম আমি।"

গিন্নী চুপ করিয়া রহিলেন।

চক্রবর্ত্তী ঘাড় নামাইয়া এক দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান মাটির উপর লেখা রহিয়াছে।

তারপর হঠাৎ গিন্নীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "এক কাজ করলে হয় না? গরুর গাড়ী করে দিই বৌমাকে পাঠিয়ে।"

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "এ দেহে গরুর গাড়ীর কষ্ট কি সইবে? যেতে যেতেই মরে যাবে যে। লোকে ছিঃ ছিঃ করবে, বলবে, খরচের ভয়ে ঘরের বৌএর মড়াটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তবে কি ঐ নিয়ে ঘর-শুদ্ধ মরতে হবে নাকি?"

গৃহিণী জবাব দিলেন না।

চক্রবর্ত্তী কহিতে লাগিলেন, "তোমার ঐ ধুমসো শরীরে কিছু হবে না, হবে আমার। আমি মরলে দশ হাতে গিলবার সুবিধে হবে; স্বার্থপর মাগী।"

তারপর খানিক জিরাইয়া বলিলেন "লোকে নিন্দে করবে। তবে তো ভয়ে মরে গেলাম, গর্ত্ত খুঁজতে হবে।"

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া গৃহিণীর দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার কহিলেন, "বুড়িয়ে মরতে যাচ্ছে, এখনও মাথায় একটু বুদ্ধি হল না। যেমন গঠন তেমনি বুদ্ধি। সারা জীবন মাগী আমায় জ্বালিয়ে মারলে।"

টব্ টব্ করিয়া চক্রবর্ত্তী দরজার দিকে যাইতে যাইতে কহিতে লাগিলেন, "হাতে তুলে বিষ খেয়েছিলাম ঐ হাড়গিলে মেয়েটাকে ঘরে এনে। ছুঁড়ী নিজেও মরবে, ঘরশুদ্ধ সবাইকে মারবে।"

অন্ধকার ঘরে মেজের উপর ছেঁড়া মাদুরে সরমা শুইয়া ছিল। চক্রবর্ত্তীর কথা তাহার কানে যাইতে বাধে না। বিলম্বিত মৃত্যুর জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে, মরণকে ডাকিয়া মিনতি করিয়া কহে, "এস, আর ভুলিয়া থাকিও না। বাঁচিয়া থাকার লজ্জা হইতে হতভাগিনীকে নিষ্কৃতি দাও।"

সেদিনকার সেই কলহের পর কয়েকদিন কর্ত্তা ও গিন্নীতে কথা বন্ধ। কর্ত্তা অবশ্য ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া কথা বলিতেছেন, "ঐ ঘরটার ভিতর হরদম যাচ্ছে আর পেটে করে বিষ পুরে এনে ঘরে ছাড়ছে। সবাইকে মেরে ছাড়বে।"

গৃহিণী কর্ণপাত না করিয়া গম্ভীর বদনে আপনার কার্য্যে চলিয়া যান।

"কেউ আপনার নয়। সব চাচা আপনি বাঁচা'। দুত্তোর সংসার।"

গৃহিণী নীরব।

"এ সংসারে কিসের জন্য থাকা? নিজের স্ত্রীও যার দুঃখ বোঝে না, তার সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল।" তাহাতেও গৃহিণীর পাষাণ হৃদয় গলিবার কোন আভাস দেখা যায় না।

এই অবস্থায় দিন-সাতেক কাটিল।

সপ্তাহান্তে চক্রবর্ত্তী বেপরোয়া হইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া রন্ধনরতা গৃহিণীর কাছে বসিয়া কহিলেন "ওগো শুনছ?"

গৃহিণী অভ্যাসমত বলিতে যাইতেছিলেন, "কি গো?" কিন্তু সামলাইয়া লইয়া গম্ভীর বদনে উত্তপ্ত কড়াইয়ে জল ঢালিলেন, ছাঁক করিয়া শব্দ হইল।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "তুমি কথা কইবে না বলে একেবারে প্রতিজ্ঞা করেছ না কি? সব জিনিসই রয়ে সয়ে করতে হয় গিন্নী। সংসার করতে গেলে ঘটীতে বাটীতে ঠোকাঠুকি হয়, আমরা মানুষ। তা' বলে তাই মনের মধ্যে পুরে রেখে দিলে তো সংসার চলে না। বয়স হয়েছে, রাগের সময়ে মাথার বেঠিকে যদি কিছু বলে থাকি তা' কি মনে ধরতে হয় গিন্নী।"

গৃহিণীও এতদিন কথাবার্ত্তা বলিতে না পারিয়া মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে-ছিলেন। হয় তো চক্রবর্ত্তী দম ধরিয়া থাকিলে নিজেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ফেলিতেন। তবু ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "কথা বলে কি হবে? কথা বলতে গেলেই ধমক, অপমান।"

চক্রবর্ত্তী উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া কহিলেন, "ধমক! অপমান! হেঃ হেঃ সবই তোমার ভালর জন্য গিন্নী। আমি আর ক'দিন? যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন একটু শোন দেখি। ভারী একটা পরামর্শ আছে।"

গৃহিণী ঘুরিয়া বসিয়া চক্রবর্ত্তীর দিকে মুখোমুখী হইলেন।

চক্রবর্ত্তী কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিলেন, "শশাঙ্কর বিয়ে দেবে?"

গৃহিণী কহিলেন, "সে কি গো। বৌমা বেঁচে থাকতেই? লোকে—"

কথা শেষ করিতে হইল না। চক্রবর্ত্তীর মেজাজের মাপযন্ত্র-কাঁটাটা তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু কণ্ঠস্বরকে সবলে দাবাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "তুমি ভারী অবুঝ, গিন্নী। বৌমা আর ক'দিন বাঁচবে? বড়জোর মাসখানেক। শকুর ত বিয়ে দিতেই হবে, এঁ্যা? তবে যদি এখন একটি ভাল সম্বন্ধ হাতের কাছে পাওয়া যায় তো বিয়ে দিতে আপত্তি কি?" বলিয়া থামিয়া গৃহিণীর দিকে মিনিটখানেক স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। গৃহিণীকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন, "চুপ করে থাকলে চলবে না—বেশ চিন্তা করে উত্তর দাও। লোকের কথায় কান দিও না, গিন্নী। বেটারা সব জোচ্চোর, ডাকাত। কারও ভাল দেখতে পারে না।"

গৃহিণী কহিলেন, "বৌমার চোখের সামনে শকুর বিয়ে দিতে পারবে? আর, তুমি পারলেও শকু বিয়ে করতে পারবে?"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "অবিশ্যি বৌমার মত নিতে হবে। যদি তার মত থাকে তা' হ'লে পারব না কেন? তবে শকুরই বা আপত্তি কিসের?"

গৃহিণী মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "তোমরা হলে তো কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু আজকালকার ছেলে, ওদের ধরণধারণ আলাদা। ওদের দয়া মায়া আছে।"

চক্রবর্ত্তী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "শকু আমাদের তেমন নয় গিন্নী। আমাদের কথা তার বেদবাক্য। সে কিছুতেই আমাদের অবাধ্য হবে না। তুমি দেখে নিও।"

গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন। স্বীয় পুত্রের এই অনন্যসাধারণ চরিত্র-মহিমার সংবাদেও আজ তিনি সুখী হইতে পারিলেন না।

চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর কাছে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কহিতে লাগিলেন, "খুব ভাল একটি সম্বন্ধ হাতের কাছে এসেছে। বাপের একটি মাত্র মেয়ে, আর হবারও আশা নাই। বিস্তর সম্পত্তি। বাপ বেটা চোখ বুঝলেই সব সুড় সুড় করে এসে ঘরে ঢুকবে।" বলিয়া চক্রবর্ত্তী হাত দুইটা গৃহিণীর দিক্ হইতে নিজের দিকে সঞ্চালিত করিয়া উক্ত সম্পত্তির আগমন প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিলেন।

গৃহিণীর ঔৎসুক্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল। নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কহিলেন, "কোথায় গো?"

চক্রবর্ত্তী উৎসাহিত-কণ্ঠে কহিলেন, "ঐ মুখুজ্জেদের বাড়ীতে। এসেছিল ওদের সেই রেধোর জন্যে। সে ছেলেটা তো আস্ত গণ্ডমূর্খ। চব্বিশ ঘণ্টা চরস টানে, আর স্যাকরার দোকানে দাবা পেটে। ভদ্রলোকের পছন্দ হয় নি। আমি শকুর কথা গোপনে তাকে বলেছি, নিমরাজীও হয়েছে। তবে বৌমার কথা নিয়ে একটু খুঁৎ খুঁৎ করছে। বৌমা যদি মত দেয় তবে আর কিছুটি গোলমাল থাকে না। তা' তুমি বৌমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ না ?"

গৃহিণী সজোরে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "পাগল হয়েছ না কি? মেয়েমানুষ হয়ে আমি ও-সব পারব না বাপু। যা পার তুমি করগে যাও।"

চক্রবর্ত্তী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "সে আমি আগেই জানি। বেশ তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করতে হয় আমি করছি। এখন তুমি দয়া করে ঢাক পিটিও না দেখি ?" বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

৬

সেই দিনই সন্ধ্যায় চক্রবর্ত্তী বৈঠকখানায় আসিয়া হাজির হইলেন, সঙ্গে জামাতৃ-প্রার্থী আগন্তক ; বিস্তর সম্পত্তি এবং তদুপরি একটি মাত্র কন্যার মালিক। ইহার পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, ধূলি-মলিন ও তালিখচিত। গায়ে আষাঢ়ের প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও গলাবন্ধ গরম কোট। মাথায় নাতিবিস্তৃত টাকের ওপারে একটি সুদীর্ঘ টিকি এবং এপারে রেখাঙ্কিত কপালের নীচেই দুইটি ধারাল চক্ষু। চক্রবর্ত্তীও আজ রাখালবেশ ছাড়িয়া রাজবেশ পরিয়াছেন। পরিধানে গৃহিণীর স্বহস্ত-পরিষ্কৃত কাপড় ও গায়ে শশাঙ্কর পরিত্যক্ত কামিজ, তাহাতে বোতামের বালাই নাই, গায়ে ঢলঢল্ করিতেছে। তা' করুক, কিন্তু মেজাজ আজ অত্যন্ত হাল্কা। লম্বা পা ফেলিয়া, হাত দুইটা দোলাইয়া দোলাইয়া—আজ যেন তিনি চলিতেছেন না, বাতাসে উড়িতেছেন। ভাবী বৈবাহিককে সমস্ত দিন ধরিয়া নিজের জমিদারীতে ঘুরাইয়া আনিয়াছেন। মাঠের মধ্যে যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া, হাত বাড়াইয়া, যত দূর দেখানো যায়, নিজের জমি বলিয়া দেখাইয়াছেন, পরের পুষ্করিণী নিজের বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং ভাবে ও ভঙ্গীতে ইহাও প্রায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, বলিতে গেলে এই অধিকাংশ লোকই তাঁহার প্রজা। তবে, অকৃতজ্ঞের দল জিজ্ঞাসা করিলে তাহা স্বীকার করে না।

বৈঠকখানার নিকটবর্ত্তী হইয়াই চক্রবর্ত্তী উচ্চকণ্ঠে বলিতে সুরু করিলেন, "আমার বৌমার মত মেয়ে একালে দেখা যায় না। যেমন রূপ তেমনি গুণ। যেন শাপভ্রষ্টা সাবিত্রী। তেমনি স্বামী-ভক্তি। স্বামীর জন্যে বোধ করি প্রাণ দিতে পারেন। অনেক ভাগ্যে এমন বৌ পেয়েছিলাম, তা' ভাগ্যে সইল না।" তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "নাঃ কলিকালে ভাল লোক বাঁচে না।"

আগন্তুক তাঁহার সিদ্ধান্তে সায় দিলেন কিনা অন্ধকারে বুঝা গেল না।

বৈঠকখানার ভিতর ইহার মধ্যে অন্ধকারে গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, মেজের উপর সরমা মৃতের মত পড়িয়া আছে।

দাওয়ার ওপর উঠিয়া চক্রবর্ত্তী গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, "আজ কেমন আছ মা?"

নিরর্থক প্রশ্ন। সরমা কোন জবাব দিল না। তবে, তাহার পাশ ফেরার শব্দে বুঝা গেল, সে জাগিয়া আছে।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "মা, একবার যে উঠে বসতে হবে। ভারী দরকার আছে।"

সরমা কষ্টে উঠিয়া বসিল।

চক্রবর্ত্তী একেবারে বলিলেন, "তোমার মতের উপর সব নির্ভর করছে, মা। ভালকরে বিবেচনা করে উত্তর দিতে হবে।"

সরমা অন্ধকারে জিজ্ঞাসু চক্ষে চক্রবর্ত্তীর দিকে তাকাইল।

চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেদ, "তুমি বুদ্ধিমতী, সবই ত' তুমি বুঝতে পারছ, মা। শকু নেহাৎ ছেলেমানুষ। আমরা আর ক'দিনই বা বেঁচে থাকব? তুমি থাকলে আর ভাবনা কি মা? তবে, আমাদের অদেষ্ট যে খারাপ! ভাল জিনিস থাকবে কেন? শকুর একটা ব্যবস্থা যে করতেই হবে, মা।"

চক্রবর্ত্তীর কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া সরমা আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝিয়া, নিম্নস্বরে জবাব দিল, "আমাকে কি করতে হবে, বলুন।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "তোমাকে কিছুই করতে হবে না মা। শুধু একবার হিয়া খোলসা করে বল যে, শকুর বিয়েতে তোমার অমত নাই। তার পর যা করবার, আমি সব করব।"

ঘনায়মান অন্ধকারে সরমা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তাহার কি মনে হইল কে বলিবে? হয় তো ভাবিল, সংসারে স্নেহ ও ভালবাসার প্রয়োজনাতিরিক্ত কি কোন মূল্য নাই? যতদিন তাহার প্রয়োজন ছিল সংসার তাহাকে ভাল-বাসিয়াছে, স্নেহ করিয়াছে। আজ তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাই শুষ্ক পত্রের মত সংসার তাহাকে ত্যাগ করিতেছে।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চক্রবর্ত্তী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি তোমার মত নাই, মা?"

সরমা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, "আমার মত আছে, বাবা। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলছি, আপনি আপনার ছেলের আবার বিবাহ দিন, দিয়ে সুখী হ'ন।"

চক্রবর্ত্তীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, "জানি মা তুমি মত দেবে। কি বলে যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব মা!"

সরমা কহিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, আর বেশী দিন যেন আপনাদের কষ্ট না দিই।"

চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেলেন। সরমা তেমনি বসিয়া রহিল।

৭

বাহিরে অন্ধকার ঘনতর হইতে থাকে, গাছের পাতায় পাতায় লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলিয়া উঠে ও নিভিয়া যায়; যেন অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ঝর ঝর করিয়া শুকনা পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে। সরমা নির্নিমিষ চক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাহার মনে হয়, পৃথিবীর বুক হইতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানব শুষ্ক পত্রের মত ঝরিয়া পড়িতেছে; তাহাদের জন্য পৃথিবীর কোন বেদনা নাই, কোন মমতা নাই; নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে সে তাহার বক্ষোলগ্ন সন্তানগুলিকে স্তন্যদান করে; বক্ষশ্চ্যুত হতভাগ্যদের আর্ত্ত আবেদন তাহাকে স্পর্শও করে না।

নিষ্ঠুরা ধরিত্রী! অবোধ দুর্ব্বল মানব! মৃত্যুর পরে কেহ মনে রাখিবে না। মা? তিনি কয় দিন বাঁচিবেন? স্বামী? সে ত' ভুলিবার জন্য ছট্‌ফট করিতেছে! মরণের দেরী পর্য্যন্ত সহিতেছে না! যদি তাহার একটি পুত্র থাকিত! তবে সে কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিত না। সেই পুত্র একদিন বড় হইয়া

পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইত, তাহার গৌরব সূর্য্যের জ্যোতির মত দিগ্বিদিক্ ছড়াইয়া পড়িত, লোকে তাহার দিকে বিস্মিত, মুগ্ধনয়নে চাহিয়া কহিত, "সরমার ছেলে।" সেই পুত্রের মধ্যে সরমা বাঁচিয়া থাকিত, সেই পুত্র ভগীরথের মত তাহার জীবন-জাহ্নবীকে যুগ-যুগান্তরের দিকে প্রবাহিত করিত।

সরমা ভাবে, তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কাহার আছে? না হইলে, তেমন হৃষ্টপুষ্ট, শ্রীমান্ শিশু তাহার কোলে রহিল না? আজ যদি তাহার সেই শিশু বাঁচিয়া থাকিত! তবে স্বামী কি এত সহজে তাহাকে ভুলিতে পারিত? তাহাকে ভাল না বাসুক, সেই শিশুকে একবার দেখিলে তাহাকে না ভালবাসিবার তাহার সাধ্য ছিল না কি! সরমার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে। হাত দিয়া মুছিয়া আবার ভাবিতে থাকে—পুরুষমানুষ কত সহজে ভুলিয়া যায়, অথচ মেয়েরা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। দু' দণ্ডের ভালবাসার স্মৃতিকে অমূল্য রত্নের মত অন্তরতলে লুকাইয়া রাখে। বিবাহের সময়ের কথা সরমার মনে পড়ে। দু'জনে এক পাল্কীতে চড়িয়া আসিয়াছিল। ভয়ঙ্কর গরমে সে অবিশ্রান্ত ঘামিতেছিল, শশাঙ্ক সমস্ত রাস্তা তাহাকে পাখা করিয়াছিল, দামী গরদের কাপড় দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়াছিল। বিবাহের পরে কত রাত্রি যে তাহারা না ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিয়াছিল! সারা রাত্রি ধরিয়া কত অর্থহীন, অবান্তর কথা, তবু শশাঙ্কর শুনিবার আশা মিটিতে চাহিত না। দৈবাৎ ঘুমে চোখ জুড়িয়া আসিলে, শশাঙ্ক তাহাকে ঘুমাইতে দিত না কি! কত মধুর উপায়ে তাহাকে জাগাইয়া দিত। সেই স্বামী আজ তাহাকে ভুলিয়াছে!

সরমার নিদ্রাহীন চক্ষের সম্মুখে বিবাহিত জীবনের শত শত মধুর স্মৃতি সারি বাঁধিয়া একে একে পার হইতে লাগিল।

পর দিন সকালে কাজ সারিয়া বাড়ী যাইবার সময়ে শুভী বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া কহিল, "বৌদিদি, কেমন আছ?"

সরমা চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। আজকাল সে চলাফেরা করিতে পারে না, সমস্ত দিন শুইয়া থাকে। সরমা চোখ মেলিয়া অবসন্ন কণ্ঠে কহিল, "কে, শুভী? আমার আর থাকাথাকি কি? দিন গুন্‌ছি।" বলিয়া চুপ করিয়া আবার চোখ বুজিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নড়াচড়ার শব্দে চোখ মেলিয়া শুভীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "কি রে, দাঁড়িয়ে রৈলি যে? কিছু বলবি?"

শুভী কহিল, "না বৌদিদি।"

সরমা কহিল, "তবে ?"

ইতস্ততঃ করিয়া শুভী কহিল, "চৌকাঠ পেরিয়ে তোমার কাছে বসব ?"

সরমা কহিল, "না রে, খারাপ রোগ, কারো কাছে বসতে নাই।"

শুভী কহিল, "তা হোক্ বৌদিদি, বসলে তোমার জাত যাবেক নাই তো ?"

সরমা ম্লান হাসিয়া কহিল, "আমার জাত ? না ভাই, আমার আর জাত যাবার ভয় নাই।"

শুভী আসিয়া কাছে বসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হ্যাঁ বৌদিদি, দাদাবাবুর না কি আবার বিয়ে হবেক ?"

সরমা কহিল, "হ্যাঁ।"

শুভী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মত দিয়েছ ?"

সরমা কহিল, "আমার আবার মতামত কি ভাই ? পুরুষ মানুষের বিয়ে না করলে কি চলে ?"

শুভী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তুমি বেঁচে থাকতেই বিয়ে করবেক ! মুয়ে আগুন ...আমরা যে ছোট নোক, আমাদের মিন্সেরাও..."

সরমা নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিল, "করলেই বা—"

শুভী ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। তাহার মুখে বৌদিদির দুঃখে যতগুলি সহানুভূতির কথা আসিয়াছিল, সরমার এই ঔদাসীন্যে সেগুলি আর বাহির হইতে পারিল না।—এবং কিছুক্ষণ পরে সে চলিয়া গেল।

ইহারও দিন কয়েক পরে আর এক সন্ধ্যায় শুভী সরমার কাছে বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "দাদাবাবু আজ বিয়ে করতে যাবেক।"

শুনিয়া সরমার বুকের ভিতরটা আচম্বিতে সহসা দুলিয়া উঠিল, সামলাইয়া কহিল, "কে তোকে বললে ?"

শুভী কহিল, "আমি জানি। আজ সারাদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আয়োজন হচ্ছেক। গাঁয়ের লোক কেউ জানে না।"

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে তুই দেখেছিলি ? খুব আনন্দ হয়েছে না ?"

তারপর সহসা কণ্ঠস্বরে সারা বিশ্বের মাধুর্য্য ঢালিয়া বলিল, "হ্যাঁ রে শুভী,

তোর দাদাবাবু যখন বিয়ে করতে যাবে, আমাকে দেখাবি ? ···দেখাবি ভাই, একবার, দেখব কেমন মানিয়েছে তাকে।”

শুভী সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে শুভী আসিয়া সরমাকে ডাকিয়া কহিল, “বৌদিদি জেগে আছ ? এখুনি যাচ্ছে, দেখবে ত এস।”

সরমা উঠিয়া বসিল। শুভী বলিল, “বাইরে যেতে পারবে ?”

সরমা অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাত বাড়াইয়া শুভীকে কহিল, “আমাকে ধরে নিয়ে চল্।”

শুভী তাহাকে বাহিরে আনিয়া দাওয়ায় বসাইয়া দিল। সরমা দেওয়ালে ঠেস দিয়া ক্লান্ত চোখ দু'টিকে প্রাণপণে মেলিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পাশে শুভী দাঁড়াইয়া থাকিল।

বাগানের মধ্যে বেহারারা পাল্কী নামাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের কাছে চক্রবর্ত্তী হাতে একটা লণ্ঠন লইয়া দাঁড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া চাপা গলায় কি উপদেশ দিতেছে। বর-বেশে সজ্জিত শশাঙ্ক মাটীতে পা ঝুলাইয়া পাল্কীতে বসিয়া আছে, তাহার সামনে গৃহিণী উবু হইয়া বসিয়া, তাহার হাতে একটা থালা। জননী বলিতেছেন, “বাবা, কোথায় যাচ্ছ ?”

শশাঙ্ক কহিতেছে, “তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।”

আবার জননী বলেন, “বাবা, কোথায় যাচ্ছ ?”

শশাঙ্ক উত্তর দেয়, “তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।”

আবার মাতার সেই প্রশ্ন, পুনরায় পুত্রের সেই উত্তর।

সরমা প্রাণহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

বেহারারা পাল্কী লইয়া চলিয়া গেল।

সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে গাছপালা-সমেত সমস্ত বাগানটা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু সরমা তেমনি বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সম্মুখের অন্ধকারকে মথিত করিয়া কাহার চাপা, সতর্ক কণ্ঠস্বর পুনঃ পুনঃ কহিতেছে, “দাসী আনতে যাচ্ছি।”

সরমা ভাবে, তবে তাহার কিসের দুঃখ ? কিসের অভিমান ? কাহার উপর অভিমান ? সে তো স্বামীর হৃদয়েশ্বরী নহে যে, তাহার স্থান খালি

থাকিবে? সে দাসী, স্বামীর দেহসেবিকা। তাই তাহার স্থান খালি থাকে না; একজন গেলে আর একজন অবলীলাক্রমে তাহার স্থান পূর্ণ করে।

সরমার তাহার নিরুদিদির কথা মনে পড়ে। স্বামীর কি ভালবাসাই না সে পাইয়াছে। তাহাকে দেখিতে দেখিতে স্বামী তাহার গলিয়া যায়, এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়ালে গেলে স্বামী অস্থির হইয়া পড়ে। সে বৎসর নিরুদিদি উপবাস করিয়াছিল বলিয়া তাহার স্বামী কি কাণ্ডই না করিল! নিরুদিদি সত্যই ভাগ্যবতী। সরমার মনে পড়ে, তাহার একবার জ্বর হইলে, শশাঙ্কও সারা রাত্রি জাগিয়া সেবা করিয়াছিল। কিন্তু, পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নাই। হয় ত ঐ নিরুদিদির স্বামীরই একদিন নিরুদিদির উপর বিতৃষ্ণার অন্ত থাকিবে না।

এমনি করিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সরমার মনের মধ্যে একটি চিন্তাধারা বিচিত্র গতিতে বহু বিস্মৃত স্মৃতিভূমির তট দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত তাহার কোন যোগ রহিল না, দেহের সহিত কোন সম্পর্ক রহিল না, তাহার সমস্ত চেতনা যেন দু'টি চক্ষু হইয়া স্রোতের সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। শুভী কখন পাশে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডা লাগিয়া পরদিন খুব বেগে তাহার জ্বর আসিল। কাসির সঙ্গে ঝলক ঝলক রক্ত ক্ষরণ হইতে লাগিল। সেই জ্বর আর ছাড়িল না, ভাল করিয়া জ্ঞানও ফিরিল না।

পরদিন সকালে গৃহিণী চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৌমার অবস্থা আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না। ওর মাকে একবার খবর দাও, মাগী যদি একবার শেষ দেখা দেখতে চায় তো, দেখে যাক।"

চক্রবর্ত্তী সেই দিনই খবর দিলেন।

সরমার বিকার হইয়াছে—সারাক্ষণ সরমা বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে। সে যেন অনুক্ষণ কাহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার চেতনা যেন শামুকের মত বাহ্য জগৎ হইতে গুটাইয়া অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই কেন্দ্রীভূত চেতনার সম্মুখে তাহার সমস্ত জীবন যেন পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে।

* * *

বিকারের কল্পলোকে সরমা একটি পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ লাভ করে; সে জীবনে সে স্বামী-সৌভাগ্যবতী স্ত্রী ও পুত্রবতী মাতা। তাহার মনে হয়, যে-খোকা

তাহার কোল ছাড়িয়া গিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; কত বড় হইয়াছে, কত সুন্দর হইয়াছে। খোকন তাহার কত কথা বলিতে শিখিয়াছে। পাতলা লাল ঠোঁট দু'টি নাড়িয়া টুক্ টুক্ করিয়া কথা বলিতেছে।

সরমা জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁ রে খোকা, কোথা ছিলি এতদিন?"

খোকন মুখ ভার করিয়া কহে, "কোথায় তেপান্তর মাঠে ঝাঁকড়া শেওড়া গাছের তলায় আমাকে ফেলে দিয়ে এসেছ। আমার একলা থাকতে ভয় করে মা। তাই ত আমি চলে এলাম তোমার কাছে।"

সরমা খোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরে। দুষ্ট খোকা সরমার স্তন নরম ঠোঁট দুইটি দিয়া চোষে। সরমা কহে, "ধাড়ী ছেলে, লজ্জা করে না?"

খোকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে, দাঁত দিয়ে কুট করিয়া কামড়াইয়া দেয়।

সরমা কহে, "অমন করিস না, বাবা। ওতে কি কিছু আছে রে? বোকা ছেলে?"

* * *

শাশুড়ী কাছে ডাক দিয়া কহেন "ও বৌমা, কি বলছ?"

সরমা দুই চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত করিয়া অবসন্নকণ্ঠে কহে, "অ্যাঁ?"

গৃহিণী কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ করিয়া কহেন, "কি বলছ মা?"

সরমা চোখ বুজিয়াই কহে, "খোকা।"

* * *

সেই দিন রাত্রে খোকা জিদ্ ধরিল, সে এখানে থাকিবে না। বলে, "ছাই যায়গা, অন্ধকার গুমোট ঘর, থাকতে ভাল লাগে না। চল মা, সেখানে চলে যাই।"

সরমা কহে, "আমি যে যেতে পারব না, ধন।"

খোকন হাসিয়া ওঠে, "তোমার ভয় কি মা, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব।"

সরমা কষ্টে উঠিয়া বসে, দাঁড়ায়, হাত বাড়াইয়া কহে, "চল তবে।"

খোকন আগাইয়া চলে, প্রসারিত হস্ত খোকনের কাঁধে রাখিয়া সরমা চলে তাহার পিছে পিছে।

* * *

চক্রবর্ত্তীর চিঠি যথাস্থানে যথাসময়ে পৌছিয়াছিল। গাঙ্গুলীদের বড়কর্ত্তা এতদিন ছোট-বৌকে সরমার কোন সংবাদ দেন নাই। কতদিন ছোট-বৌ বড়-জাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে "হ্যাঁ দিদি, সরমার কোন খবর এসেছে? কেন যে মন এমন করছে কে জানে? মেয়েটা যাওয়ার পর থেকে একটা খবর দিলে না!"

বড়-জা প্রত্যেক বার চাপিয়া গিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তীর চিঠি পাইয়া বড়কর্ত্তা বড়গিন্নীর মারফৎ ছোট-বৌকে জানাইলেন, সরমার ভারী অসুখ হইয়াছে। ছোট-বৌকে দেখিতে চাহিতেছে। ছোট-বৌমার যাইতে ইচ্ছা হইলে, তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

সেই দিনই রাত্রে গরুর গাড়ী চাপিয়া ছোট-বৌ কুসুমপুর রওয়ানা হইলেন।

সারারাত্রি গাড়ীর মধ্যে ছোট-বৌ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

গাড়োয়ানকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ রে আর কত দূর?"

গাড়োয়ান পুনঃ পুনঃ জবাব দিতে লাগিল, "আর রশি-টাক। হেই যে দেখা যাচ্ছে মা ঠাকরুণ। হৈ সামনের গাঁটা পারালেই।"

শেষরাত্রে গাড়ী কসুমপুর ঢুকিল। গরুর গাড়ীর শব্দে কতকগুলা কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের দু'একজন সঙ্গে সঙ্গে আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গাড়োয়ানের ব্যবহারে নিরুৎসাহ হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

সমস্ত গ্রাম নিদ্রাচ্ছন্ন; শুধু মাঝে মাঝে দু'একজন বৃদ্ধের কাসির শব্দ ও দু' একটা ছোটছেলের কান্নার শব্দ। চক্রবর্ত্তীর বাড়ী গ্রামের অন্য প্রান্তে। গাড়ীটা বাড়ীর কাছে আসিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। গাড়োয়ানের ধমক খাইয়াও গরু দুইটা চলিতে চাহিল না, অগত্যা লোকটা গাড়ী হইতে নামিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, কে একজন ঠিক রাস্তার উপরে আড়া-আড়ি শুইয়া আছে। কহিল, "ও মা ঠাকরুণ, কে একজন মাঝরাস্তায় ঘুমাচ্ছে।"

ছোট-বৌ কহিলেন, "সে কি রে, দেখি।" বলিয়া নামিয়া নিদ্রিতের কাছে গিয়া কহিলেন, "রাস্তায় ঘুমোচ্ছিস কে রে? ওরে ও গাড়োয়ান, আলোটা আন ত, দেখি।"

গাড়োয়ান গাড়ীতে বাঁধা লণ্ঠনটা খুলিয়া আনিতে গেল।

নিষ্ঠুরা রাত্রি অসংখ্য দীপ্ত চক্ষু মেলিয়া নিঃশব্দ বেগে সীমাহীন অন্ধকার-পারাবার পার হইতে লাগিল। ধরণীর কোন এক অখ্যাত পল্লীর নির্জ্জন পথপ্রান্তে এইমাত্র একটি শোকবিদ্ধ মাতৃহৃদয় ভূমিতে লুটাইয়া আর্ত্তনাদ করিবে, মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া তাহা দেখিবার তাহার সময় নাই। তুচ্ছ পৃথিবীর তুচ্ছতম মানবীর ব্যথায় তাহার লক্ষ লক্ষ নয়নের একটিতেও বিন্দুমাত্র অশ্রু ঝরিবে না।

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে-যে খুলি দ্বার,
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,
তারই সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি লবে মোরে রথে,
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে॥

—রবীন্দ্রনাথ

বিবাহ-বার্ষিকী

স্বামী ও স্ত্রীতে কলহ হইয়া গেল। আজকাল কলহের জন্য সবিশেষ কারণের প্রয়োজন হয় না। যে কোন সাংসারিক আলোচনা আরম্ভ হইলেই কলহে গিয়া শেষ হয়। কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়; দুই জনেই মুখ গম্ভীর করিয়া ঘুরিতে ফিরিতে থাকে; ছেলেমেয়েরা দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কোন রকমে সাংসারিক যোগসূত্র বজায় রাখে। আবার দিন কয়েক পরে যে কোন পক্ষ কথাবার্ত্তা শুরু করিয়া কলহের অবসান করে। এমনই করিয়া ক্রমান্বয়ে জোয়ার ও ভাটার মধ্য দিয়া ইহাদের দাম্পত্য-জীবন-প্রবাহ বহিয়া চলে।

কিন্তু বর্ত্তমান মনোমালিন্যের সবিশেষ কারণ আছে। বিকালে ধোপাকে কাপড় দিবার সময়ে স্ত্রী শ্রীমতী নীরজা, স্বামী শ্রীমান নিরঞ্জনের জামার ঘড়ির পকেট হইতে এক মনি-অর্ডারের রসিদ টানিয়া বাহির করিয়াছে। রসিদটি ইংরেজীতে লেখা এবং বিশেষ করিয়া পোস্ট-অফিসের কেরানীবাবুর হাতের লেখা। কাজেই নীরজা তাহার স্বল্প ইংরেজী বিদ্যার সাহায্যে লেখার জট ছাড়াইয়া, প্রেরক বা গ্রাহক, কাহারও নাম উদ্ধার করিতে পারে নাই। কিন্তু কাহাকেও যে টাকা পাঠানো হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহ নাই। পোস্ট-অফিসের কেরানীবাবুরা তো বিনা পয়সায় রসিদ বিলি করিয়া বেড়াইতেছে না! কিন্তু কি অন্যায়! স্বামী সারা মাস চাকুরী ও টিউশানি করিয়া মোট আশিটি টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। ওই সামান্য টাকায় এই কলিকাতা শহরে স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে লইয়া এত বড় সংসারটি যে কি করিয়া চলে, তাহা নীরজাই জানে। বিশেষ করিয়া কোলের খোকাটি সংসারে আসিবার পর হইতে রীতিমত টানাটানি শুরু হইয়াছে। বাজারে চাল-মসলার দোকানে দেনা হইয়াছে। দোকানদার টাকার জন্য নিত্য লোক পাঠাইতেছে। দুধওয়ালার কয়েকটা টাকা বাকি পড়িয়াছে; পুরাতন খরিদ্দার হাতছাড়া করিতে চাহে না তাই, না হইলে দুধ বন্ধ করিয়া দিত। ধোপা তো দুই মাস

হইল কিছুই পায় নাই ; নেহাত নিরীহ গোবেচারা লোক বলিয়া নীরজা তাহাকে কোনমতে শান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ছেলেমেয়েদের সব কয়টিরই জামা-কাপড় ছিঁড়িয়াছে ; ভাগ্যে বাহিরে যাইতে হয় না এবং কোন আত্মীয়-কুটুম্বের আসা-যাওয়া নাই ; তাই, না হইলে নূতন না তৈয়ারী করাইয়া দিলে চলিত না। বড় মেয়েটির গৃহ-শিক্ষা অনেকদিন সমাপ্ত হইয়াছে, এর পর স্কুলে পাঠানো উচিত ; কিন্তু তাহার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আর নীরজার নিজের কথা না বলাই ভাল। শীতে সারা অঙ্গ ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে ; স্বামীকে কত দিন হইতে একটা সস্তা ক্রীম আনিতে বলিয়াছে ; শীত শেষ হইতে চলিল, এখনও তাহা আসিয়া পৌছে নাই। কানের ফুল দুইটি স্যাকরার দোকান হইতে একটু সারাইয়া আনিলেই পরা যায় ; নিত্য দুই বেলা দোকানের সামনে দিয়া যাওয়া-আসা করে, একদিনও মনে পড়ে না। হাতের চুড়িগুলির যে চেহারা হইয়াছে, তাহাতে আর পরা যায় না, অথচ নূতন করিয়া কোনদিন গড়াইতে পারিবে বলিয়া তো ভরসা হয় না। তাও ভাগ্যে বিবাহের সময় বাবা দিয়াছিলেন, তাই, না হইলে শুধু শাঁখা ও লোহা পরিয়াই দিন কাটাইতে হইত। অথচ নীরজা সেদিন বাপের বাড়ী গিয়া নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সইয়ের স্বামী স্কুল-মাষ্টারি করিয়া সইকে নূতন প্যাটার্নের এক হাত ঝকঝকে চুড়ি গড়াইয়া দিয়াছে। নীরজার মনে পড়িল, এই স্কুল-মাস্টারের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ; নেহাত গরীব বলিয়া বাবা মত করেন নাই, তাহা ছাড়া নীরজারও মত ছিল না। কিন্তু সে কথা যাক, নিরঞ্জনের কি বুদ্ধি-শুদ্ধি কোন দিনই হইবে না? এই অবস্থায়, উপরি দুই-পাঁচ টাকা যাহাই হাতে আসে, সংসারে না দিয়া দানখয়রাত করিয়াছে? কাহাকে কে জানে! বড় দাদাটিকে বোধ হয়। তাঁহার তো টাকার চাহিদা আজ পর্য্যন্ত মিটিল না। যখন-তখন কারণে-অকারণে চিঠি ঝাড়িলেই হইল—টাকা পাঠাও। ছোট ভাই হাকিমি করিয়া হাজার হাজার টাকা ঘরে আনিতেছে যে! সামান্য বিশ-পঁচিশ টাকা দিলে তাহার কি আসিয়া যাইবে?

হাসিও পায় দুঃখও হয়। সত্যি, পাড়াগাঁয়ের লোকদের সাধারণ বুদ্ধি ভারী কম। ভাবে, সাহেবেরা বি. এ., এম. এ. পাস করা ছেলেদের আগের মত এখনও ডাকিয়া বড় বড় চাকুরি দেয়। দিনকাল যে বদলাইতেছে, আজকালকার

ছেলেরা, বিশেষ করিয়া হিন্দুর ছেলেরা, যে বড় বড় পাস করিয়াও ভদ্রভাবে দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন-সংস্থানের জন্য রাস্তায় রাস্তায় দিশাহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে—কিছুতেই বুঝিতে পারে না, পারিলেও বুঝিতে চাহে না।

নিরঞ্জন আপিস হইতে ফিরিলেই নীরজা কথাটি বলি-বলি করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর, নিরঞ্জন যখন, মুখ-হাত ধুইয়া খাবার খাইতে বসিল, তখন তাহার সামনে চাপিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, কাকে টাকা পাঠিয়েছ আবার ?

নিরঞ্জন অর্দ্ধচর্ব্বিত খাদ্য কোনমতে গিলিয়া ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, কই, না তো ।

নীরজা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, সত্যি বলছ, পাঠাও নি ?

নিরঞ্জন প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

নীরজা খুঁট হইতে রসিদটি খুলিয়া বাহির করিয়া, মোড়ক খুলিয়া ভাল করিয়া প্রসারিত করিল; তারপর একটু আগাইয়া বসিয়া সেটিকে স্বামীর সামনে ধরিয়া কহিল, দেখ তো এটা কি ?

এক মুহূর্ত্তে নিরঞ্জনের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, মনি-অর্ডারের রসিদ—

এটি কোথায় ছিল বল দেখি ?

কি করে জানব ?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া নীরজা কহিল, জান না ? ছিল তোমার বুক পকেটে। কি করে এ'ল বলতে পার ?—বলিয়া অধরোষ্ঠ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

নিরঞ্জন উর্দ্ধমুখে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সত্যই তো! কি করিয়া আসিল ? নিরঞ্জনের কিছুই মনে পড়িতেছে না। তাহাকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্য কেহ গোপনে গুঁজিয়া দিয়া যায় নাই তো! কিংবা নীরজাই হয়তো—

নীরজা প্রশ্ন করিল, কি গো! মনে পড়েছে ?

এক মুহূর্ত্তে নিরঞ্জনের মুখ-চোখ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পড়েছে, ওটা বড়বাবুর রসিদ।

জেরা হইল, বড়বাবুর রসিদ তোমার পকেটে কেন ?

আমাকে দিয়ে মনি-অর্ডার করিয়েছিলেন। রসিদটা দিতে ভুলে গেছি। ভাল ক'রে রেখে দাও দেখি, কাল দিয়ে দিতে হবে।

নীরজা হাঁক দিয়া ডাকিল, টুকু, শোন।

চার বছরের ছেলে টুকু এতক্ষণে ওত পাতিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ডাক পড়িতেই ছুটিয়া আসিয়া বাবার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, এবং বার দুই এদিক ওদিক চাহিয়া, বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই নীরজা আদেশের স্বরে কহিল, দাঁড়া। খোকা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া মা ও বাবার দিকে তাকাইতে লাগিল।

নীরজা স্বামীকে কহিল, ওর মাথায় হাত দিয়ে বল দেখি, কাউকে টাকা পাঠাও নি।

নিরঞ্জন ঘাবড়াইয়া গেল ; কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া অনুযোগের স্বরে কহিল, ছি নীরু ! কথায় কথায় ছেলেমেয়ের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে আছে ! ওতে অকল্যাণ হয়।

নীরজা তীব্রকণ্ঠে কহিল, হোক অকল্যাণ, তুমি হাত দাও। তোমার মত যার স্বামী, তার আর অকল্যাণ হতে বাকি কি ?

কৃত্রিম পরিহাসের সহিত নিরঞ্জন কহিল, তাই নাকি ! বেশ। তা একটু-খানি অপেক্ষা কর, খেয়ে হাত-মুখ ধুই আগে, এঁটো হাত তো আর মাথায় দেওয়া যায় না।—বলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়াই গম্ভীর মুখে খাইতে প্রবৃত্ত হইল।

টুকু কহিল, তা হোক বাবা, তুমি হাত দাও।—বলিয়া 'উবু হইয়া বসিয়া মাথাটি বাড়াইয়া দিল।

মাথায় হাত দেওয়া ব্যাপারটা টুকুর সুপরিচিত। কারণ, সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাগযুদ্ধ বাধিলে সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য প্রায়ই তাহার মাথার জন্য তলব পড়ে, এবং মাথায় হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। কাজেই শান্তি-স্থাপনের জন্য, এবং বিশেষ করিয়া বাবা যে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া হস্ত-চালনা শুরু করিয়া দিয়াছে, ইহার জন্য টুকু ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

নীরজা কহিল, বেশ তো, বাঁ হাতটাই দাও।

নিরঞ্জন বিরক্তির সহিত কহিল, তুমি যে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছ দেখছি।

নীরজা পাল্টা জবাব দিল, যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হ'লে যে আমার চলছে না।

স্ত্রীর রসনায় রসক্ষরণ শুরু হইয়াছে দেখিয়া নিরঞ্জন চুপ করিয়া গেল। তারপর টুকুকে কহিল, এপাশে আয়।

টুকু সরিয়া বসিতেই তাহার মাথায় বাম হাত দিয়া নিরঞ্জন কহিল, কাউকে টাকা পাঠাই নি। হয়েছে তো?—বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরজার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তারপর ঢকঢক করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া উঠিয়া পড়িল।

নীরজা কহিল, উঠছ যে?

নিরঞ্জন জবাব দিল না। টুকু খাইতে সুরু করিয়াছিল, বাবাকে উঠিতে দেখিয়া সাগ্রহে কহিল, বাবা আর খাবে না?

নিরঞ্জন কহিল, না বাবা। তুমি খাও, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

টুকু নিশ্চিন্ত চিত্তে চৌকস হইয়া বসিয়া খাইতে লাগিল।

নীরজা দীপ্ত চক্ষে নিরঞ্জনের দিকে তাকাইয়া রহিল।

নিরঞ্জন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান করিল এবং কিছুক্ষণ পরে জামা ও জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

নীরজা বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সত্যি, ভারী অন্যায় হইয়া গেল। সেই কখন সকাল নয়টার সময়ে আলুভাতে ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া কাজে গিয়াছিল। সারাদিন গাধার খাটুনি খাটিয়া বাড়ি ফিরিয়া, তাহার বোকামির জন্যই কিছুই না খাইয়া আবার বাহির হইয়া গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর কথাটা তুলিলে এমন কিছু বেদ অশুদ্ধ হইয়া যাইত না। তাহার যে আজকাল মতিগতি কি হইয়াছে, কে জানে! ধৈর্য্যের বিন্দু-বিসর্গ নাই। কথায় কথায় রাগ হইয়া যায়, রাগ হইলে কিছুই মুখে আটকায় না। অথচ রাগ পড়িয়া গেলে অনুশোচনার সীমা থাকে না। আর নিরঞ্জন? সেই কি আর আগের মতটি আছে? আগে কত ঠাণ্ডা মেজাজ ছিল, আজকাল কথায় কথায় রাগ অভিমান। একটা কথা সহ্য করিতে পারে না, ভাল কথা বলিলেও রাগিয়া টং হইয়া যায়। তাহার না হয় সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে মাথার ঠিক থাকে না, কিন্তু নিরঞ্জনকে তো আপিসের কাজটুকু ছাড়া আর কোন ঝামেলাই পোয়াইতে হয় না। তবে কেন দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছে? আগে কত আমোদ করিত, গল্প করিত, সংসারের কাজ

হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার সহিত কত দুষ্টামি করিত; আপিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া আর বাড়ির বাহির হইতে চাহিত না, কেবল তাহার কাছে কাছে ঘুরঘুর করিত। আর আজকাল? কেমন যেন আলগা-আলগা ভাব—স্ত্রী ছেলেমেয়ে কাহারও উপর যেন সত্যকার টান নাই। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, মুখ তোলো হাঁড়ি। আপিস হইতে বাড়ি ফিরিলেই কে যেন চাবুক মারিতে থাকে, নাকে মুখে যা হোক কিছু গুঁজিয়া বাড়ির বাহির হইতে পারিলে যেন বাঁচে।

প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা আবার ভাবে, কেন এমন হইল? স্বামী কি তাহাকে আর ভালবাসে না? আর কোন হতভাগীর উপর তাহার মন পড়িয়াছে? এই কলিকাতা শহরে কাহারও সহিত আলাপ করিবার কোন সুযোগ ও সুবিধা তো তাহার নাই। তবে কি পূজার সময় দেশে গিয়া কোন মেয়ের সহিত ভাব করিয়া আসিয়াছে? পূজার পর দেশ হইতে ফিরিবার পর হইতেই এই ভাবটা বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নীরজা শুনিয়াছে, দেশের কোন একটা মেয়ের সঙ্গে নিরঞ্জনের বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া গিয়াছিল, দেনা-পাওনার গোলমালেই নাকি সব ভাঙ্গিয়া যায়। মেয়েটাও নাকি সুন্দরী। নিরঞ্জন তাহারই পাল্লায় পড়িয়াছে নাকি?

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কলিকাতা শহরে ছোট একতলা বাড়িগুলিতে সন্ধ্যা একটু আগেই আসিয়া হাজির হয়। সারা শহরের যত ধূলি ও ধূম দিনের আলো নিবিতে না নিবিতে এই সব বাড়িগুলিতে রাত্রের আশ্রয়ের জন্য ভিড় করে। নীরজাদের বাড়িটি অবশ্য একতলা নয়, দোতলা। উপরতলায় তিনখানা ঘর ও একটুখানি ছাত, তাহাতে বাড়িওয়ালা স্বয়ং একপাল ছোট বড় ছেলেমেয়ে এবং তাহাদের জননীটিকে লইয়া বাস করেন। নীচের তলায় তিনখানি ছোট ঘর নীরজারা ভাড়া লইয়াছে। শুধু ঘর তিনটি নহে, উঠানটিও তাহাদেরই বলিতে হইবে। অবশ্য উঠান দিয়া সকলেরই যাওয়া-আসা করিতে হয়। কিন্তু কাপড়-চোপড় শুকাইতে দেওয়া, বিছানাপত্র রোদে দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে উঠানটি ব্যবহার করিবার অধিকার তাহারাই ভোগ করে। কল-পায়খানা চুক্তি-মত এজমালি; কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্তা বাড়িওয়ালা-গৃহিণী বেলা নয়টা পর্য্যন্ত কি নিজেদের, কি নীরজাদের, কাহাকেও কলতলার পাশ মাড়াইতে দেন না।

নীরজার বড় মেয়ে টুনি, ছোট খোকাকে কোলে লইয়া কাছে আসিয়া ডাকিল, মা, শুনতে পাচ্ছ না ?

নীরজা চমকিয়া চাহিয়া কহিল, কি ?

জ্যেঠামশায় বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা-খাঁকারি দিচ্ছেন যে।

সত্য, বাড়িওয়ালা ঘনশ্যামবাবু, সিগন্যাল না পাইলে রেলগাড়ির চালক যেমন স্টেশন হইতে দূরে দাঁড়াইয়া বাঁশী ফুঁকিতে থাকে, তেমনই ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া অদূরে কলতলার পাশে দাঁড়াইয়া পুনঃ পুনঃ গলা-খাঁকারি দিতেছিলেন। ঘনশ্যাম-বাবুর দেহ শীর্ণ, গলাটি শীর্ণতর; তদুপরি সারাদিন সওদাগরী আপিসে কলম পিষিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন; কাজেই গলা-খাঁকারিতে খাম্বাজী গমক ছিল না, তা ছাড়া নীরজার মনও কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছিল।

নীরজা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া চাপা ত্রস্তকণ্ঠে কহিল, কই। কোথায় ?—বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

টুকু তখনও খাইতেছিল, বিশেষ করিয়া আরও দুইটি ভাগীদারের আবির্ভাব দেখিয়া, দ্রুত হস্তে কাজ সারিতেছিল।

ঘনশ্যামবাবু পার হইয়া যাইতে যাইতে টুকুকে কহিলেন, জ্যেঠামশায়ের কি হচ্ছে ?

টুকু গম্ভীরভাবে জবাব দিল, আপিস থেকে এসে খাচ্ছি জেতামছাই।

কিছুক্ষণ পরে নীরজা টুনিকে কহিল, দেখে আয় দেখি, তোর জ্যেঠামশাই কি করছেন ?

টুনি উপর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তামাক খাচ্ছেন !

খাওয়া হয়ে গেছে ?

টুনি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ। তারপর কহিল, জ্যেঠীমারা কাল থিয়েটার দেখতে যাবেন, সারারাত থিয়েটার, শিব-দুর্গা-কৃষ্ণ-রাধা আরও কত সব ঠাকুর-দেবতা দেখাবে; বাবাকে বল না মা, আমাদেরও নিয়ে যেতে !

নীরজা ধমক দিয়া কহিল, থিয়েটারে যাবে, না আর কিছু! কাল কি ক'রে বাজার হবে, তার ঠিক নেই—

টুনি কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, তোমার তো ওই এক কথা বরাবর, সংসার চলছে না। কলকাতা শহরে জন্মালাম, এতদিন থাকলাম, তবু কিচ্ছুটি দেখতে

পেলাম না। এর চেয়ে পাড়াগাঁয়ের লোকরা ঢের ভাল, ধান-চাল বিক্রি ক'রেও ছেলেমেয়েদের শহর দেখিয়ে নিয়ে যায়।

টুনি মেয়েটি এই বয়সেই বেশ কথা বলিতে শিখিয়াছে। ইহাতে অবশ্য বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বাংলা দেশের কড়া আবহাওয়ায় ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠে। নীরজাও বিস্মিত হইল না, বরং একটু লজ্জিত হইল। টুনি তো মিথ্যা বলে নাই! নেহাত গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়া ছেলেমেয়েদের কোন সাধই তাহারা মিটাইতে পারে নাই। ছেলেদের কথা ছাড়িয়া দাও, ভগবানের কৃপায় মানুষ হইলে একদিন হয়ত তাহাদের সব সাধ মিটিবে। কিন্তু মেয়ের? কয়দিনই বা বাপমায়ের কাছে থাকিবে? বিবাহ হইয়া গেলেই তো পর হইয়া যাইবে; তারপর বৎসরে একটিবার মাত্র দেখিতে পাইবার জন্য পরের পায়ে মাথা ঠুকিতে হইবে। তাও যদি ভাল ছেলের হাতে পড়ে তো সাধ-আহ্লাদ মিটিবে না হইলে বাপের বাড়িতেই যাহা হইয়া গেল, তাহাই শেষ। নিজের কথা মনে পড়িয়া নীরজার নিশ্বাস পড়িল, ভাবিল, ছেলে ভাল হইলেও হইবে না, ভাগ্য থাকা চাই। না হইলে তাহার বাবা তো কোন ত্রুটি করেন নাই, হাজার-হাজার টাকা খরচ করিয়া দেশের সেরা ছেলেটি তাহার জন্য খুঁজিয়া আনিয়াছিলেন।

নীরজা কোমলকণ্ঠে কহিল, তাই হবে বাপু, গোলমাল করিস নি। কাল ওঁদের সঙ্গে তোকে পাঠিয়ে দোব। কিন্তু এক কাজ কর দেখি, এই কাগজটা তোর জ্যেঠামশায়কে পড়িয়ে আনগে।—বলিয়া সেই রসিদটা তাহার হাতে দিল।

টুনি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, জ্যেঠামশায় বললেন, কে গৌরমোহন ভটচাযকে টাকা পাঠানো হয়েছে।

কে পাঠিয়েছে, কিছু বললেন?

টুনি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না তো। কিন্তু মা, কালই আবার 'না' বলতে পাবে না কিন্তু। আমি জ্যেঠাইমাকে ব'লে এলাম, আমি যাব।

নীরজা চিন্তিত মুখে কহিল, তাই হবে। তুই আর একটিবার যা দেখি মা, জিজ্ঞেসা ক'রে আয়, কে পাঠিয়েছে?

টুনি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, জ্যেঠামশায় বললেন, ওসব কিছু লেখা নেই।

গৌরমোহন নামধারী নিরঞ্জনের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর কথা নীরজার মনে পড়িল না। তবে নিরঞ্জন মিথ্যা বলে নাই। বড়বাবুই কোন আত্মীয়কে টাকা পাঠাইয়াছে। সে মিছামিছি নিরঞ্জনের সঙ্গে ঝগড়া করিল, সারাদিনের খাটুনির পর তাহাকে খাইতে দিল না। অনুশোচনায় নীরজার মাথা ঠুকিতে ইচ্ছা হইল।

ইচ্ছা হইল, নিরঞ্জন যাহা কিছু খাইতে ভালবাসে, সেই সব বাছিয়া বাছিয়া, বসিয়া বসিয়া, মনের মত করিয়া রান্না করে। কিন্তু ঘরে কি কিছু আছে ছাই! কাল সকালে বাজার না আসিলে রান্না হইবে না। তাহা ছাড়া মাস শেষ হইতে চলিয়াছে, হাত একেবারে খালি। মাহিনা পাইলে আগামী রবিবারে যা হোক একটা কিছু ছুতা করিয়া একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিতে হইবে। হঠাৎ নীরজার মনে পড়িল, সেই মাসেই তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। আজ মাসের কত কে জানে! ডাক দিয়া কহিল, টুনি! তোর জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞেস ক'রে আয় তো আজ মাসের কত?

টুনি আসিয়া কহিল, ১১ই ফাল্গুন। কেন মা? কাল বুঝি তা হ'লে আমাকে যেতে দেবে না?

নীরজা হাসিয়া কহিল, ওঃ! পাগল হয়ে গেছে! দোব দোব, বলছি যে পঞ্চাশবার ক'রে।

টুনি চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, তোমাদের কথায় বিশ্বাস নেই বাপু। ভাল-ভালয় যতক্ষণ না বার হতে পারছি, ততক্ষণ অসোয়াস্তি।

তাহার কথায় নীরজার কান নাই। কাল ১২ই ফাল্গুন। পনরো বৎসর আগে ওই দিনে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। সে দিনের কথা নীরজা কি কোন দিন ভুলিবে? নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সে দিন! কত আশা, কত স্বপ্নের সমাপ্তি—কত নূতন আশা, কত নূতন স্বপ্নের সূত্রপাত! কত আলো! কত বাঁশী! কত উল্লাস! কত উচ্ছ্বাস! জীবনের সেই একটি দিনের জন্য তাহাকে ঘেরিয়া এই আনন্দোজ্জ্বল উৎসব-রাত্রি পদ্মের মত বিকশিত হইয়াছিল। নীরজার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, বিয়ের দিন সন্ধ্যার পর দইয়ে হাত দিয়া সে বসিয়া ছিল; হঠাৎ বাজনার শব্দ শোনা গেল; সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—বর আসছে, বর আসছে; ছেলে মেয়ে পুরুষ সকলে ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল; মা আসিয়া কহিলেন, যাস নি, এইখানে ব'সে থাক, উঠলে অকল্যাণ হয়। তারপর সকলের

আগে মা আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া, মুখে চুমু খাইয়া কহিলেন, রাজ-পুত্তুরের মত ছেলে, শিবপূজা তোর সাত্থক হয়েছে মা। তারপর শুভদৃষ্টি। সারা অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়াছিল, তবু জোর করিয়া তাকাইয়াছিল সে। চোখে চোখ মিলিতেই কিন্তু লজ্জায় চোখ নামাইয়া লইয়াছিল। তারপর সারারাত্রি ধরিয়া বাসর—নিরঞ্জন কিছুতেই গান গাহিবে না। মেয়েরা কত অনুরোধ-উপরোধ করিল, ঠাট্টা করিল, এমন কি শেষে উৎপীড়ন করিতে শুরু করিল; নিরঞ্জন শুধু মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তারপর শেষরাত্রে সবাই যখন একে একে চলিয়া গেল এবং যাহারা রহিল, তাহারাও ঘুমাইয়া পড়িল, তখন নীরজা বার কয়েক কাসিয়া জানাইয়া দিল, সে জাগিয়া আছে। তবু নিরঞ্জন কথা কহিল না। শেষে সে নিজে লজ্জার মাথা খাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ঘুমুবে না? কতদিনের কথা! তবু এখনও ভাবিতে ভারী মিষ্টি লাগে! মনে হয়, সত্যই কি তাহার জীবনে এমন একটি দিন আসিয়াছিল, না কোন দিন স্বপ্ন দেখিয়াছিল সে!

নিরঞ্জন বাড়ি ফিরিয়া জামা-জুতা ছাড়িয়া শুইয়া পড়িল। টুনি আসিয়া ডাক দিল, বাবা, খেতে আসুন, মা ডাকছে।

নিরঞ্জন বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, যাব না, বলগে যা, ক্ষিদে নেই।

টুনি ফিরিয়া যাইতে যাইতেই হাঁক দিয়া কহিল, মা, বাবার ক্ষিদে নেই; বলছেন, খাবনা।

নীরজা কহিল, তুই ব'স, আমি ডেকে নিয়ে আসছি।

বাহিরে পদশব্দ শুনিতেই নিরঞ্জন পাশ ফিরিয়া কাঠ হইয়া শুইয়া রহিল।

নীরজা পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল; তারপর কহিল, খাবে এস, শুনচ? কোন জবাব মিলিল না। নিরঞ্জন নিশ্চয়ই গভীর নিদ্রামগ্ন।

গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিয়া নীরজা কহিল, শুনছ খাবে এস।

নিরঞ্জনের নিদ্রাভঙ্গ হইল, শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে কহিল, কিছু খাব না, শরীর ভাল নেই।

নীরজা মুচকি হাসিয়া কৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, শরীর খারাপ হয়েছে! মাথা ধরেছে বুঝি? যা পার খেয়ে নেবে এস, তারপর খেয়ে-দেয়ে মাথা টিপে দোব এখন।

নিরঞ্জনের ক্ষুধা পাইয়াছে, তবু সন্ধ্যার ওই দুর্ব্যবহারের পর এত সহজে খাইতে রাজি হওয়া ঠিক নহে; অতএব কহিল, ক্ষিদে নেই।

প্রশ্ন হইল, ক্ষিদে নেই কেন, হ্যাঁগো?

নিরঞ্জন বোধ হয় আবার ঘুমাইয়া পড়িল, নিশ্বাস ঘন হইয়া উঠিতেছে।

বগলের নীচে একটু চাপ দিলেই নিরঞ্জনের কাতুকুতু লাগে। নীরজা একটু চাপ দিতেই নিরঞ্জন বিচলিত হইয়া উঠিল, একটু সরিয়া গিয়া কহিল, বলছি খাব না, তবু বিরক্ত করছে! নীরজা আর একবার চাপ দিয়া আবদারের সহিত বলিল, চল না লক্ষ্মীটি।—বলিয়াই আর একবার সজোরে চাপ দিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নিরঞ্জন বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আচ্ছা নাছোড়বান্দা কিন্তু! বলছি, ক্ষিদে নেই, তবু—। নীরজার কণ্ঠস্বর নকল করিয়া কহিল, চল না, লক্ষ্মীটি!

নীরজা হাসিয়া কহিল, নাছোড়বান্দাই তো! তুমি না চললে যে আমার চলবার জো নেই গো। সেই কুশণ্ডিকার দিন পায়ে পায়ে চলা মনে নেই?

ভাব হইয়া গেল।

শুইতে আসিয়া নীরজা কহিল, আজ কত তারিখ বল দেখি?

মাসের ইংরেজী তারিখ সম্বন্ধে মাস-মাহিনার চাকুরেরা অতীব ওয়াকিবহাল। নিরঞ্জন ঝটিতি জবাব দিল, কেন, ২৫এ ফেব্রুয়ারি, আর দিন পাঁচ পরেই মাইনে পাব।

কৃত্রিম ঝাঁজের সহিত নীরজা কহিল, তোমার কেবল ওই হচ্ছে—টাকা! টাকা! বাংলা তারিখ মনে নেই?

সিলেবাসের বহির্ভূত প্রশ্ন! নিরঞ্জন মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল।

গালে হাত দিয়া, চোখ ডাগর করিয়া বিস্ময়ভরা কণ্ঠে নীরজা কহিল, অদ্ভুত মানুষ! মনে নেই? (যেন তাহার নিজেরই মনে ছিল) আজ যে ১১ই ফাল্গুন —কাল ১২ই।—বলিয়া নিরঞ্জনের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

নিরঞ্জন হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তাই নাকি? তা হ'লে—

নীরজা তেমনই তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, তা হ'লে কি?

কাল তো কিছু খরচ আছে, তোমার হাতে, মানে, আমার হাতে—

নীরস কণ্ঠে নীরজা কহিল, তোমার যে ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল গো! কিন্তু আগের কথা মনে কর দেখি।

সত্যই! বিবাহের পর প্রতিবৎসর তাহারা অতীব নিষ্ঠার সহিত নিখুঁত-ভাবে বিবাহ-বার্ষিকী উৎসবটি সম্পন্ন করিত। তখনও নীরজার কোলে ছেলে-মেয়েরা কেহ আসিয়া হাজির হয় নাই। কাজেই আয় অপ্রচুর হইলেও অভাব কম ছিল। তা ছাড়া মন ছিল তরুণ ও তরল; স্বল্প আনন্দ এবং স্বল্প দুঃখের আঘাতেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিত। সেই সময়ে এই দিনটিতে তাহারা সারাদিন-ব্যাপী উৎসব ও আনন্দের ব্যবস্থা করিত। তারপর যত দিন যাইতেছে, আয় বিশেষ বাড়ে নাই, কিন্তু সংসার বাড়িতেছে, অভাব অহরহ দন্তবিকাশ করিয়া চোখের সামনে ঘোরা-ফেরা করিতেছে, এবং আনন্দ ও বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রার তুহিন-শীতল স্পর্শে মনের রস জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এখন সহজ দুঃখ ও সহজ আনন্দ মনের কাছে আমলই পায় না। আগে সারা বৎসর ধরিয়া যে দিনটিকে তাহারা বিশেষভাবে মনে করিয়া রাখিত আজকাল তাহার কথা সহজে মনে পড়িতে চাহে না। তবু প্রতিবৎসর, এমন কি গত বৎসরও, এই দিনটি তাহারা কোনমতে পালন করিয়াছে।

নিরঞ্জন আমতা আমতা করিয়া কহিল, তা বটে।

নীরজা মুখভার করিয়া কহিল, তোমার যদি ইচ্ছে না হয় তো কি দরকার!

নিরঞ্জন নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া আগ্রহের ভান করিয়া কহিল, পাগল নাকি! প্রতিবৎসর করেছি।

নীরজা তেমনই ভাবে কহিল, করলেই বা প্রতিবৎসর। আমাকে স্ত্রী ব'লে যতদিন ভালবাসতে, ততদিন করেছ। এখন তো আর ভালবাস না, মিছিমিছি ওসব ক'রে কাজ নেই আর।—বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

নিরঞ্জন খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, আবার পাগলামি শুরু করলে! কে তোমার মাথায় ওসব বুদ্ধি দিয়েছে বল দেখি?—বলিয়া একটু আকর্ষণ করিতেই নীরজা একেবারে স্বামীর কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, ও কি আর কারও কাছে বুঝতে হয়? মেয়েমানুষ আপনা থেকেই বুঝতে পারে।

নীরজার এই নিরীহ নির্ভরপরায়ণা মূর্ত্তিটি নিরঞ্জনের খুব ভাল লাগে। তাহার

ক্ষীণস্রোত প্রেম আবার চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু হায়! আনন্দ-সমুদ্রের সঙ্গে একদা যে যোগসূত্র ছিল, আজ তাহা বোধ হয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু নিরঞ্জন নীরজার মুখখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সস্নেহে কহিল, পাগল!

* * *

নীরজা কহিল, তোমার কোন ভাবনা নেই। আমার কাছে পাঁচটি টাকা আছে; সেই যে, বাবা খোকার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন।

অভয়বাণী শুনিয়া নিরঞ্জন নির্ভয় হইয়া উঠিল। তখন দুইজনে মিলিয়া কর্ম্মসূচী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

নীরজা কহিল, কাল বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমোলে হবে না কিন্তু।

নিরঞ্জন কহিল, পাগল নাকি! আমি আজ ঘুমোবই না তো কাল ওঠা—

না, ঠাট্টা নয়। কাল সকাল সকাল বাজার করতে যাবে, আটটার মধ্যে সব কিনে বাড়ী ফিরতে হবে।

বেশ, কি কি কিনতে হবে বল।

ভোজ্য ও পেয় দ্রব্যাদির তালিকা করিয়া নীরজা কহিল, দোকান থেকে ভাল চীনে সিঁদুর, এক শিশি তরল আলতা, আর এক ডজন ধূপকাঠি কিনে এনো, চন্দন আর ধূনো বাড়িতেই আছে।

নিরঞ্জন কহিল, আর মালা? মাল্যদান হবে না?

নীরজা মুচকি হাসিয়া কহিল, সকালে এনো না, ছেলেমেয়েরা রয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় আপিস থেকে ফেরবার সময় কিনে এনো। আর দেখ, কাল রাত্রে আর টিউশনি করতে গিয়ে কাজ নেই। ছেলেটিকে বরং একটা খবর পাঠিয়ে দিও।

নিরঞ্জন সোৎসাহে কহিল, পাগল নাকি! কাল কোথাও যাব না, আপিস থেকেই সকাল সকাল ছুটি নিয়ে পালিয়ে আসব বরং। কিন্তু নীরজা, কাল তোমাকে ঠিক বিয়ের দিন যেমনটি সেজেছিলে, তেমনই সাজতে হবে। ময়ূরকণ্ঠী রঙের বেনারসী শাড়িটি পরবে; সর্ব্বাঙ্গে পরবে স্বর্ণ-অলঙ্কার; পায়ের পাতা দুটি আলতার রসে রাঙা টুকটুকে করবে; কপালে আঁকবে চন্দন-লেখা; আর পার তো, চোখে ফোটাবে সেই সে দিনের মত সুদূর শুকতারার স্বপ্ন, আর মুখে উদয়াকাশের রক্তিমাভা—

নীরজা নিরঞ্জনের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। নিরঞ্জনের এমন ধারা কথা, এমন কণ্ঠস্বর, এমন চোখের দৃষ্টি অনেক দিন শুনে নাই, দেখে নাই। তবে কি নিরঞ্জনের ভালবাসা একেবারে নিবিয়া যায় নাই! ছাই-চাপা পড়িয়াছিল, একটু ফুঁ দিতেই আবার ঝকমক করিয়া উঠিল।

পরদিন বেলা আটটা। নিরঞ্জন বাজারে গিয়াছে। নীরজা রান্নাঘরে বসিয়া কালকার বাজারের যা দুই-চারিটি আলু-বেগুন অবশিষ্ট ছিল, তাহাই কুটিতেছিল। পাশাপাশি দুইটা উনানে ডাল ও ভাত ফুটিতেছে, নামিতে দেরি নাই। এখন আর বেশি রান্না হইবে না। আলু ও বেগুন ভাজিয়া কোনমতে খাওয়াইয়া নিরঞ্জনকে আপিস বিদায় করিবে। তারপর এবেলার খাওয়া-দাওয়া সকাল সকাল চুকাইয়া দিয়া ওবেলার জন্য আয়োজন করিতে বসিবে।

এমন সময়ে হাঁক শোনা গেল, বউদি!

নীরজা কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্বরের মালিক সম্বন্ধে আন্দাজ করিয়া কহিল, কে? চারুঠাকুরপো?

অচিরে চারুচন্দ্র আসিয়া হাজির হইল,—বয়স একুশ কি বাইশ; সাধারণ চেহারা; এখানকার কলেজে পড়ে সে; নিরঞ্জনের সম্পর্কে ভাই; দেশে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেশের খবর দিতে আসিয়াছে। চারুচন্দ্রের সহিত আসিল টুকু; হাঁটিয়া নয়, কাঁধে চড়িয়া।

নীরজা কহিল, ব'স ঠাকুরপো। দেশে গিয়েছিলে বুঝি? কখন এলে? টুকুকে কহিল, নাম, ঘাড় ধ'রে যাবে যে! নেমে ওই আসনটা পেতে দে দেখি তোর কাকার জন্যে।

টুকু ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই চারু তাহাকে নামাইয়া দিল। টুকু আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া কহিল, বছুন।

নীরজা হাসিয়া কহিল, বসছেন। তুই যা দেখি। খেলগে যা। এই তো এক পেট খেয়ে গেলি, আবার জুটলি কেন?

পৃথিবীতে মায়েরা খোকাদের মনের কথা চট করিয়া জানিতে পারে কি করিয়া? জানিতে পারিলেও এমন করিয়া সকলের সামনে ফাঁস করিয়া দেওয়া উচিত নয়। খোকা লজ্জিত হইল। তবু লজ্জার জন্য আসল কাজ মাটি করিবার পাত্র সে নয়। চারু বসিতেই সে তাহার কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল।

চারু হয়তো ভাবিল, খোকা তাহার এতদিনের অদর্শনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহার কাছ হইতে নড়িতে চাহিতেছে না। সে সস্নেহে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, থাক না বউদি।

বউদিদি কহিল, না না, তুমি জান না, ভারী পেটুক, কোথাও নড়তে চায় না, কেবল রান্নাঘরের কাছে ঘুরঘুর করে, আর কেউ এলে তো কথাই নেই।

আর থাকা চলে না। খোকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কাকাবাবু, আমি যাচ্ছি।—বলিয়া মায়ের দিকে না তাকাইয়া গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেল।

খোকা যাইতেই নীরজা কহিল, হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমাদের গাঁয়ের গৌরমোহন কে বলতে পার ?

চারু উৎসুক কণ্ঠে কহিল, কেন বল দেখি ?

না, এমনই জিজ্ঞাসা করছি।

গাঁয়ের এত লোক থাকতে হঠাৎ তার কথা ?

উনি বলছিলেন সেদিন—

কি বলছিলেন ?

বলছিলেন—বেশ ভাল লোক, ওঁর বিশেষ বন্ধু।

বিস্ময়ের সহিত চারু কহিল, তাই নাকি ! দাদা বলছিলেন ওই কথা ?

নীরজা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ, বলছিলেন তো। কেন বল দেখি ? কে তিনি ?

চারু ঝাঁজের সহিত কহিল, আর ভক্তি ক'রে তাকে 'তিনি' বলতে হবে না। সে একটা হতভাগা, গাঁজাখোর, জোচ্চোর ; কাজের মধ্যে মামলা-মকদ্দমায় সাক্ষী দেওয়া, গাঁয়ে ঘোঁট পাকানো, আর স্ত্রীকে ধ'রে যখন তখন ঠেঙানো। অথচ এমন স্ত্রী—

নীরজা উৎসুক কণ্ঠে কহিল, কে ঠাকুরপো ?

চারু দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, কেন ? আমাদের কাঞ্চনদিদি, সতী-সাবিত্রীর কথা বইয়েই পড়েছ বউদি, যদি চোখে দেখতে চাও তো দেখে আসবে গিয়ে।

নীরজা নীরস কণ্ঠে কহিল, কি ক'রে দেখব ঠাকুরপো ! কখনও তো নিয়ে

গেলেন না তোমার দাদা। ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, এবার যেমন ক'রে পারি, দেখে নয়ন সার্থক ক'রে আসব।

চারু উচ্ছ্বাসের সহিত কহিল, ঠাট্টা নয় বউদি, সত্যি। গরিবের ঘরে জন্মেছেন বটে, কিন্তু রাজকন্যার মত রূপ! কিন্তু হতভাগার হাতে প'ড়ে কি কষ্টই পাচ্ছেন! ছুবেলা পেট ভ'রে খেতে পান না, ভাল ক'রে পরতে পান না, তার ওপর স্বামীর অত্যাচার, তবু কি কোন দিন মুখ ফুটে কিছু বলেন? ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কখনও না। বরং স্বামীর ওপর কি ভক্তি! কি সেবা! মাস ছুই আগে গৌরমোহনের টাইফয়েড হ'ল, শুধু ওঁর সেবার গুণেই বেঁচে উঠল। সবাই বলছে, স্বামীর যে কেমন ক'রে সেবা করতে হয়—কাঞ্চন দেখালে বটে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যাক, আর বেশি দিন কষ্ট সহ্য করতে হবে না। যা অসুখ দেখে এসেছি, বেশি দিন আর বাঁচবেন না।

নীরজা কৃত্রিম আগ্রহের সহিত কহিল, কেন? কি হয়েছে?

অনেক দিন অনাহারে থাকলে যা রোগ হয়, তাই—যক্ষ্মা, প্রায় এক বছর আগে হয়েছে। চিকিৎসা তো কিছু হয় নি, কাজেই রোগ মনের সাধে বেড়েছে, এখন একেবারে শেষ ক'রে এনেছে। ক্ষোভের সহিত কহিল, সারা জীবনটা কাঞ্চনদিদির কষ্টেই কেটে গেল।

নীরজা নীরস কণ্ঠে কহিল, যে যেমন কপাল ক'রে আসে ঠাকুরপো, কি করবে বল? বোধ হয় আর-জন্মে কাউকে কষ্ট দিয়ে এসেছিল, তাই—

চারু কহিল, কি জানি! হয়তো তাই, তা না হ'লে—। বলিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

নীরজা সাগ্রহে কহিল, না হ'লে কি ঠাকুরপো? চুপ ক'রে গেলে কেন?

মৃদু হাসিয়া চারু কহিল, মানে—নিরঞ্জনদাদার সঙ্গেই তো আগে কাঞ্চনদিদির বিয়ে সব স্থির হয়ে গিয়েছিল। নিরঞ্জনদাদারও খুব ইচ্ছে ছিল, শুধু কাঞ্চনদিদির মামা টাকা দিতে পারলেন না ব'লে জ্যেঠামশায় রাজি হলেন না।

নীরজার মনে পড়িল, বিয়ের সময় তাহার এক ননদ একটি ফর্সামত মেয়েকে দেখাইয়া কহিয়াছিল, ওই মেয়েটির সঙ্গে দাদার সম্বন্ধ হয়েছিল। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, তোমার দাদা বুঝি ওর জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, না?

চারু হাসিয়া কহিল, পাগল আবার কি! বিয়ের সম্বন্ধ তো কত মেয়ের সঙ্গেই হয়। কাঞ্চনদিদি দেখতে শুনতে ভাল ব'লেই বোধ হয় নিরঞ্জনদাদার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, ভালবাসা-বাসি কিছু ছিল না, তুমি আবার এই নিয়ে দাদার সঙ্গে মাতামাতি ক'রো না।

নীরজা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাঁকাভাবে কহিল, আমরা তোমার কাঞ্চনদিদির মত সতী-সাবিত্রী নয় ব'লে কি স্বামীর সঙ্গে দিনরাত মাতামাতিই ক'রে থাকি ঠাকুরপো? তোমার দাদাও কিছু আমাকে দিনরাত রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাখেন নি, দুঃখ-কষ্ট আমাকেও সহ্য করতে হয়। তবু তাই নিয়ে কোন দিন কিছু বলি কি না, তোমার দাদাকেই জিজ্ঞাসা ক'রো।

চারু বুঝিতে পারিল বউদিদি চটিয়া উঠিতেছে। কাজেই তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তোষামোদের সুরে কহিল, আমি কি আর তা জানি না বউদি! না, কিছু দেখি নি! গাঁয়ে গিয়ে তোমার কি রকম প্রশংসা করি, একবার নিজে গিয়ে শুনে আসবে। তা ছাড়া দাদাও তোমার খুব প্রশংসা করেন।

নীরজা নিরুৎসুক কণ্ঠে কহিল, তাই নাকি! বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তোমার কথাটা কি রকম হ'ল জান ঠাকুরপো? না—ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি তো কলা খাই নি। যদি ভালবাসা নাই ছিল, তবে অমন ক'রে চাপতে গেলে কেন?

চারু প্রবোধ দিয়া কহিল, সে তো অনেক দিনের কথা বউদি। তা ছাড়া তোমার মত স্ত্রী!—ভালবাসা থাকলেও সে কোন্ দিন ম'রে ভূত হয়ে গেছে।

মুখ আঁধার করিয়া নীরজা শুষ্ককণ্ঠে কহিল, তা কি হয় ঠাকুরপো! ভাবিল, তাই স্বামী তাহাকে দেশে লইয়া যাইতে চাহে না—আর দেশ হইতে ফিরিলে মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকে, ছয় মাসের আগে মুখে হাসি ফুটে না। কিন্তু কি মিথ্যাবাদী, কি শঠ, কি প্রবঞ্চক!

চারু চলিয়া গেল। নীরজা তাহাকে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আর রান্নাঘরে ফিরিল না; সোজা শয়নকক্ষে ঢুকিয়া একটা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিল। আর সে রান্নাবান্না কিছুই করিবে না, ছেলেপিলেদের খোঁজ রাখিবে না, সংসার দেখিবে না। কেন দেখিবে? কাহার সংসার? যে চিরদিন তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, মিথ্যা ভালবাসার ভান করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, অথচ চিরদিন আর একজনকে মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছে, তাহার সহিত সম্পর্ক কি?

বিয়ের উৎসব! ঝাঁটা মার বিয়ের মুখে! বরই যখন আপনার নয়, তখন আর বিয়ে কি? নীরজা কি এতদিন জানিত! জানিলে কোন্ দিন বিষ খাইয়া সম্পর্ক চুকাইয়া দিত। কিন্তু কি মিথ্যাবাদী! লেখাপড়া শিখিয়া লোকে এত মিথ্যা কথা বলিতে পারে! তা আবার ছেলের মাথায় হাত দিয়া! মুখে একটুও বাধিল না! ছেলে মেয়ে স্ত্রী কাহারও উপর কি স্নেহ-ভালবাসা আছে? নেহাৎ উপায় নাই, তাই বোধ হয় জড়াইয়া আছে, অন্য জাতি হইলে এতদিন সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া দিয়া সেই পোড়ারমুখীর কাছে গিয়া জুটিত। তাহা ছাড়া তলে তলে এতদিন কি করিয়াছে, কে জানে! কোথায় টাকা পাইয়াছে, কবে টাকা পাঠাইয়াছে, কোনও কথাটি জানিতে দেয় নাই। ভাগ্যে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাই, না হইলে কি নীরজা জানিতে পারিত? আরও হয়তো কতবার টাকা পাঠাইয়াছে! কত প্রেমের চিঠি লিখিয়াছে! সারাক্ষণ বাহিরে বাহিরে থাকে; কোথায় কখন কি করে, নীরজা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া জানিবে কি করিয়া?

নিরঞ্জন বাজার হইতে ফিরিয়া আসিল।

টুনি, টুকু ও ছোট খোকাকে লইয়া রোয়াকে খেলা করিতেছিল। বাবাকে দেখিয়া সকলে হৈ-হৈ করিয়া ছুটিয়া কাছে আসিল। টুনি তাড়াতাড়ি তরকারির বোঝাটি নিরঞ্জনের হাত হইতে তুলিয়া লইয়া উৎফুল্ল মুখে কহিল, এত জিনিস .কি হবে বাবা?

নিরঞ্জন জবাব না দিয়া মৃদু হাসিল।

টুকু দুই হাতে তালি দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, ওরে, আমাদের বাড়ি আজ নেমন্তন্ন হবে, কি মজা!

নিরঞ্জন ভিতরে ঢুকিয়া রান্নাঘরে অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখিয়া টুনিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর মা কোথায়?

টুনি কহিল, জানি না তো! জানেন বাবা, চারুকাকা এসেছিলেন এখনই, মায়ের সঙ্গে গল্প ক'রে চ'লে গেলেন।

নিরঞ্জনের মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল,—চারু কি গল্প করিয়া গেল, কে জানে! টুনিকে কহিল, তুই এখানে ব'সে থাক, তোর মা কোথায় দেখি।—বলিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নীরজা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। কাছে আসিয়া নিরঞ্জন কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে একদৃষ্টে নীরজার দিকে তাকাইয়া

রহিল। শারীরিক অসুস্থতা? এক ঘণ্টা আগে তো বিন্দুমাত্র আভাস ছিল না, তা ছাড়া শরীর সত্য সত্য অসুস্থ হইলেও শয্যাশায়িনী হইবার মত মেয়ে তো নীরজা নয়! তবে? মানসিক দুর্য্যোগ? কিন্তু তাহারও লক্ষণ তো কিছু আগে দেখা যায় নাই! চারু এমন কি কথা বলিয়া গেল, যাহার ফলে নির্ম্মল নীল আকাশে এক মুহূর্ত্তে ঘনঘটা করিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিল!

নিরঞ্জন মুখের কাপড় খুলিবার চেষ্টা করিতেই, নীরজা তাহার হাতটি সজোরে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, দিক ক'রো না, যাও।

নিরঞ্জন ভয়ে ভয়ে কহিল, কি হ'ল?

নীরজা জবাব না দিয়া চাদরটা ভাল করিয়া টানিয়া গুটাইয়া শুইল।

নিরঞ্জন সবিনয়ে নিবেদন করিল, যা যা বলেছিলে, সব নিয়ে এসেছি, মায় ধূপকাঠি, সিঁদুর, তরল আলতা।

নীরজা গম্ভীর স্বরে কহিল, ফেলে দাওগে।

নিরঞ্জন অনুযোগের স্বরে কহিল, এতগুলো পয়সা খরচ হ'ল—

এক মুহূর্ত্তে চাদরটা ছুঁড়িয়া দিয়া নীরজা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দুই জলন্ত চোখের দৃষ্টি নিরঞ্জনের দিকে উদ্যত করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, খুব যে পয়সার ওপর দরদ দেখছি, আর ওদিকে যে মুঠো মুঠো টাকা যাকে তাকে দান ক'রে আসছ, তাতে কিছু হয় না, না?

নিরঞ্জন বিস্ময়ের সহিত কহিল, সে আবার কি? দান আবার কাকে করলাম?

কিছুক্ষণ নিরঞ্জনের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া নীরজা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ওঃ! ঢের ঢের মিথ্যেবাদী দেখেছি, তোমার জুড়ি আর একটিও দেখি নি। ছেলের মাথায় হাত দিয়েও তোমার মিথ্যে বলতে বাধে না! তুমি শুধু—

নিরঞ্জন বাধা দিয়া নিরপরাধ-সুলভ বিমূঢ়তার সহিত কহিল, কি বলছ? ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল দেখি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

নীরজার চোখ দুইটা আবার জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, দেখ, ন্যাকামি ক'রো না বলছি। গৌরমোহনকে টাকা পাঠাও নি তুমি?

নিরঞ্জন কহিল, পাঠিয়েছিলুম তো।

তবে কাল মিথ্যে বললে কেন?

তুমি চেঁচামেচি করবে ব'লে।

তার ভয়ে তুমি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে মিথ্যে বললে? আমার ওপর না থাক, ছেলেমেয়ের ওপরও বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা নেই? সেই হতভাগী ডাইনী এমন ক'রে তোমাকে পাষাণ ক'রে দিয়েছে!

পরম বিস্ময়ের সহিত নিরঞ্জন কহিল, সে আবার কে?

কেন? তোমার গলার মালা—কাঞ্চনমালা। যার জন্যে দিনরাত বুক ফেটে ম'রে যাচ্ছ, একবার চোখ পেতে আমাকে দেখতে পারছ না। সব জানতে পেরেছি গো, চারুঠাকুরপো সব ব'লে গেছে, আর মিথ্যে কথায় ভুলছি না। নেহাৎ ছেলেমেয়েগুলোকে তোমার মত পাষাণের হাতে ফেলে যেতে পারছি না, না হ'লে অনেকক্ষণ গলায় দড়ি দিতাম।

নিরঞ্জন কহিল, কি যে পাগলের মত যা-তা বলছ!

নীরজা রোষদীপ্ত কণ্ঠে কহিল, কি! আমি পাগলের মত কথা বলছি! লজ্জা করে না তোমার? ক্রমোচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়েকে ভাল ক'রে খাওয়াবার পরাবার ক্ষমতা নেই তোমার, আর তুমি একটা মাগীকে মাসে মাসে মাসোহারা দিচ্ছ?

নিরঞ্জন কহিল, অত চেঁচাচ্ছ কেন? বাইরে ছেলেমেয়েরা রয়েছে, ওপরে ওঁরা সব রয়েছেন—

নীরজা রীতিমত চেঁচাইয়া কহিল, বেশ করব চেঁচাব, তুমি একটা বেশ্যাকে নিয়ে বেলেল্লাগিরি ক'রে বেড়াবে, আর আমি চুপ ক'রে থাকব? সবাইকে শোনাব আমি, রাস্তার লোক ডেকে এনে আমি শোনাব।

নিরঞ্জন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিতেই নীরজা কহিল, দরজা বন্ধ করলে কেন? মারবে নাকি?

নিরঞ্জন ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, আমাকে কি মনে করেছ বল দেখি? তোমাকে মারব আমি? মেরেছি কোন দিন? সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কেন মিথ্যে মন খারাপ ক'রে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করছ, বল দেখি?

নীরজা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তোমাকে আর আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে পারব না। আমাকে অনেক ঠকিয়েছ তুমি। তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার সংসারের জন্যে আমি প্রাণপাত করেছি, ভাল খাই নি, ভাল পরি নি, কোন দিন সাধ-আহ্লাদ করি নি, আর তুমি কিনা ভিতরে ভিতরে আমার সর্ব্বনাশ করছ!

স্বামী যার আপনার নয়, তার বাঁচা কিসের জন্যে! তার বিষ খেয়ে মরাই ভাল।—বলিতে বলিতে নীরজা হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিরঞ্জন তাহার মাথায় হাত দিয়া প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেই নীরজা কহিল, আমাকে ছুঁয়ো না তুমি, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার।—বলিয়া আবার শুইয়া পড়িয়া আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

টুনি ঘরে ঢুকিয়া কহিল, মা, ভাত-ডাল পুড়ে কয়লা হয়ে গেল যে!

নীরজা কহিল, নামিয়ে দিগে যা, আমি পারব না কিছু করতে।

নিরঞ্জন কহিল, আপিসের বেলা হয়ে গেল, রান্না করবে না?

নীরজা অশ্রুবিকৃত, ঝাঁঝালো কণ্ঠে কহিল, আমি কারও দাসীবাঁদী নয় যে, সাত-সকালে রেঁধে দিতে হবে। কেন? সেই পেয়ারের মাগী এসে রেঁধে দিক্।

নিরঞ্জন কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিরঞ্জন না খাইয়াই আপিস চলিয়া গেল।

টুনি আসিয়া কহিল, বাবা না খেয়েই চ'লে গেলেন।

নীরজা চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল; ঔদাস্যের সহিত জবাব দিল, তা আমি কি করব?

টুনি অনুযোগের স্বরে কহিল, রান্না করলে না কেন?

নীরজা ক্লান্ত কণ্ঠে কহিল, কি করব বল? যন্ত্রণার ভঙ্গি করিয়া কহিল, ভারী মাথা ধরেছে—উঃ একটু মাথাটা টিপে দে তো মা।

টুনি খোকাকে মায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া মায়ের মাথা টিপিতে বসিল। খোকা মায়ের কোল ঘেঁসিয়া, বুকে মুখ গুঁজিয়া স্তন্যপান করিতে লাগিল।

নীরজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, খাবার ছিল, দিলি না কেন খেতে?

টুনি কহিল, বললাম তো। বাবা বললেন—থাক, তোরা খাবি।

টুকু আসিয়া কান্না শুরু করিল। সে প্রতিদিন বাবার থালায় খাইতে বসে। পাশের বাড়িতে খেলিতে গিয়াছিল, খেলা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। আসিয়া দেখে, এই ব্যাপার—বাবা নাই, থালা নাই, রান্নাঘরে রান্নার কোন ব্যবস্থা নাই, সর্ব্বোপরি মায়ের এ বিষয়ে কোন চাড় নাই। ইহা দেখিয়া জগতের কোন্ খোকা না কাঁদিয়া থাকিতে পারে?

টুনি ধমক দিয়া কহিল, চুপ কর না পেটুক। দশটা বাজতে না বাজতে ক্ষিদেয় ম'রে যাচ্ছেন।

অত্যাচারের উপর অপমান! খোকা কান্না উচ্চতর গ্রামে চড়াইল।

নীরজা উঠিয়া বসিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, কাঁদিস নি বাবা, চুপ কর। যাচ্ছি; তোদের হাতে যখন পড়েছি, মরতে মরতেও আমার সোয়াস্তি নেই, আমি জানি।

রান্নাবান্না সারিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া নীরজা রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিতেই টুনি কহিল, তুমি খাবে না?

নীরজা কহিল, তোর বাবা খেলেন না, আর আমি খেয়ে-দেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে ব'সে থাকব? তোর এই বুদ্ধি হচ্ছে বুঝি?

টুনি অপ্রতিভভাবে কহিল, তাই আমি বলছি নাকি? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু বাবা তো সেই কখন আসবেন, আমার যাওয়ার কি হবে?

গম্ভীরভাবে নীরজা কহিল, তুই যাবি।

টুনি কহিল, ও রকম রেগে গোমড়া মুখ ক'রে বললে, যাওয়া যায় নাকি?

আবার কেমন ক'রে বলতে হবে? ভাল ক'রেই বলছি তো।

বাবা যদি বকেন?

না, বকবেন না, আমি বুঝিয়ে ব'লে দোব।

অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া টুনি দোতলায় চলিয়া গেল। ঘর হইতে কোনমতে বাহির হইতে না পারা পর্য্যন্ত টুনির শান্তি নাই।

কোলের ছেলেটি অনেকক্ষণ দুধ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টুকুও ঘুমাইয়া পড়িল। নীরজা টুকুর পাশে শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসিল না। স্বামী যে আজ কোন্ সকালে এক কাপ চা খাইয়া সারাদিন উপবাসী আছে, এই চিন্তাই তাহার মনের গায়ে অবিরত সূচ ফুটাইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, দিন দিন কি করিতেছে সে? কাল সারাদিন খাটুনির পর খাইতে দিল না, আজ না খাইতে দিয়া সারাদিন খাটিবার জন্য বিদায় করিয়া দিল! তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা দিন দিন লোপ পাইতেছে নাকি? অবশ্য তাহাকে লুকাইয়া কোথাকার কে একটা মেয়ের চিকিৎসার জন্য টাকা পাঠানো স্বামীর অন্যায়; আবার ধরা পড়িয়া, মিথ্যা বলিয়া অন্যায় ঢাকিবার চেষ্টা গুরুতর অন্যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সে মাথা গরম করিয়া

ঝগড়া করিতে গেল কেন? বুঝাইয়া বলিলেই পারিত—হাজার বার বিয়ের কথা হইলেও কোন মেয়ে কোন পুরুষের আপনার জন হয় না; মা-বাপ দেবতা সাক্ষ্য করিয়া যাহাকে হাতে তুলিয়া দেন, সেই সত্যকার আপনার; শুধু এ জন্মে নয়, জন্ম-জন্মান্তরে; এই কথা না বুঝিয়া যদি কোন হতভাগী পরের জিনিস টানাটানি করে, তাহার অদৃষ্টে ইহজন্মে অশেষ দুঃখ, আর পরজন্মে অনন্ত নরক; স্বামী তো অবুঝ নয়, বুঝাইলেই বুঝিত। তা ছাড়া আজকার দিনটা এমনই ভাবে কাটিল! স্বামীর তো কোন দোষ নাই। কত আগ্রহে খুঁজিয়া-পাতিয়া যাহা সে বলিয়া দিয়াছিল, সব জিনিসগুলি কিনিয়া আনিয়াছে। ভাবিয়াছিল, কত আনন্দ করিবে সে। তা নয়, চারুঠাকুরপোর কথা শুনিয়া মিথ্যা সে আজ স্বামীকে দুঃখ দিল, সারাদিন তাহাকে এক কণা অন্ন মুখে তুলিতে দিল না।

নীরজা উঠিয়া বাহিরে আসিল। দোতলায় ঘনশ্যাম-গৃহিণী ও তাঁহার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। টুনি বোধ হয় গৃহিণীর ছোট মেয়ে আন্নাকালীর সঙ্গে পাতা-বিন্তি খেলিতে বসিয়াছে। কলতলায় এঁটো বাসনগুলাকে ঘিরিয়া বসিয়া কতকগুলা কাক কলরব সহকারে আলাপ ও আহার করিতেছে। একজন বাসনওয়ালা কাঁসর বাজাইয়া বাড়িতে বাড়িতে ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে। পাড়ার একজন বড়লোকের বাড়ির দেউড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। চারিটার আগে কলে জল আসিবে না। নীরজা কক্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। আসিতেই সামনের দেওয়ালে তাহাদের বিবাহ-সময়ের ছোট ফোটোটি চোখে পড়িল; তাহার এক পিসতুতো ভাই বিয়ের পরদিন তুলিয়াছিলেন। একটি চেয়ারে নিরঞ্জন বসিয়া আছে—গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরিধানে গরদের ধুতি, পায়ে পাম্প-শু; কোঁচার কুঞ্চিত প্রান্তটি তির্য্যকভাবে মেঝের উপর লুটাইতেছে। নিরঞ্জন হাত দুইটি কোলের উপর রাখিয়াছে; এমন ভাবে রাখিয়াছে, যেন মণিবন্ধে সোনার রিস্টওয়াচটি সকলের চোখে পড়ে। নীরজা মৃদু হাসিয়া মনে মনে কহিল, বাইশ বছর বয়সেও কত ছেলেমানুষ ছিল! আর কত দুষ্ট! নিত্য নিত্য কত কুমতলব মাথায় খেলিত! নীরজা কিছুতেই তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। আর এখন? কত বদল হইয়াছে, শুধু আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতেও। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা নিজের ছবিটির পানে চাহিল। নিরঞ্জনের পাশে সে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ডান হাতটি

নিরঞ্জনের ঘাড়ের উপর ন্যস্ত। পরনে তাহার বেনারসী শাড়ি, সেই ময়ূরকণ্ঠী শাড়িটি, যেটি পরিলে নিরঞ্জন নাকি আর কোন দিকে চোখ ফিরাইতে পারিত না (অবশ্য এটি নিরঞ্জনের কথা); সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণ-অলঙ্কার; গলায় ফুলের মালা। তখন কত সুন্দর দেখিতে ছিল সে—কেমন টানা টানা চোখ, কেমন মুখের ডৌল; তাহার মত সুন্দরী নাকি তাহাদের বাড়ির আর কোন মেয়ে ছিল না। সাধে কি নিরঞ্জন এক মুহূর্ত্ত কাছ-ছাড়া হইতে চাহিত না, ধমক খাইয়াও পাছে পাছে ফিরিতে চাহিত! আর এখন? কত বিশ্রী চেহারা হইয়া গিয়াছে তাহার। পাশেই দেওয়ালে একটা মাঝারি গোছের আয়না টাঙ্গানো ছিল; তাহার সামনে দাঁড়াইয়া নীরজা নিজেকে দেখিয়া ভাবিল, সত্যি ভারী বিশ্রী! গাল দুইটা কে যেন চড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; চোখের কোল বসিয়া গিয়াছে; সারা মুখে কোঁচ পড়িয়াছে। আর মাথার একরাশ কালো কালো কোঁকড়ানো চুল! খোলা থাকিলে যাহা সারা পিঠ ছাইয়া কোমর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত, খোঁপাতে যাহা আটক মানিত না, সব উঠিয়া গিয়া এখন 'চৈতন-চুটকি' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নীরজার আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ভাবিল, চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই কি স্বামীর এমনই আলগা-আলগা ভাব? চোখ পাতিয়া চাহিয়া দেখে না। সারাক্ষণ বাহিরে বাহিরে থাকে, ঘরে ফিরিয়া কেবল ঘুমাইবার চেষ্টা। চোখ বুজিয়া কাঞ্চনের কথা ভাবে নাকি? কে জানে! চারুঠাকুরপো বলিয়াছে, স্বামী একদিন কাঞ্চনকে ভালবাসিত। পাড়াগাঁয়ের রূপসী মেয়ে কাঞ্চন হয়তো কোন দিন নিরঞ্জনের মনে দাগ বসাইয়াছিল; কিন্তু তখন তো সে নীরজাকে দেখে নাই! তাহার চেয়েও কি কাঞ্চন রূপসী ছিল? কখনও না। কাঞ্চন যদি কোন দিন কোন দাগ বসাইয়া থাকে তো নীরজা তাহা ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া শুধু রূপ দেখিয়াই কি পুরুষ ভালবাসে? রূপে বাঁধা পড়ে, পোষ মানে গুণে। চারুঠাকুরপো কাঞ্চনের গুণের ব্যাখ্যান করিতে করিতে গদ্গদ হইলেও, সে গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারে, সে যেমন করিয়া স্বামীকে সকল দিক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে, সংসারের আঁচটি পর্য্যন্ত গায়ে লাগিতে দেয় নাই, এমন খুব কম মেয়েমানুষই পারে। নিরঞ্জন কি তাহা বোঝে না? খুব বোঝে, তাই কোন দিন তাহার মন বিঁধিয়া একটা কথা বলে না, শত ধমকেও চুপ করিয়া থাকে। টাকা পাঠানো অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছে বলিয়াই তো সে মিথ্যা বলিয়া

ঢাকা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহা ছাড়া কোন দিন তো তাহার বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করে নাই। ভালমানুষ পাইয়া কত লোক তো কতবার ঠকাইতে চেষ্টা করিয়াছে; নীরজাই ঠকিতে দেয় নাই। সেবার নিরঞ্জনের এক বিধবা বোন মেয়ের বিবাহের জন্য টাকা আদায় করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে ভাই-বোনে কত পরামর্শ! নীরজা মনে মনে আন্দাজ করিয়াছিল, কিন্তু স্বামী মুখ ফুটিয়া না বলা পর্য্যন্ত কিছু বলে নাই। নিরঞ্জন বাড়ি হইতে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে একদিন তাহাকে সব খুলিয়া বলিল। সেই দিনেই নীরজা ননদকে ডাকিয়া মিষ্টভাবে দুই-চারিটি স্পষ্ট কথা বলিতেই তিনি বিদায় লইলেন। ভারী মুখচোরা লোক! যে যাহা বলে, তাহাতেই—। হুঁ, কাহারও দুঃখের কথা শুনিলে গলিয়া জল হইয়া যায়। সেবার এক বন্যার উপলক্ষ্যে সভায় গিয়া, বক্তৃতা শুনিয়া, নিজের সোনার আংটিটি দিয়া আসিল। গৌরমোহন হয়তো কাঞ্চনের রোগের কথা, নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া চিঠি লিখিয়াছে। তাই, হয়তো কোথাও ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়াছে; কাঞ্চনের স্বামী বলিয়া নয়, যে কেহ এমনই করিয়া লিখিত, তাহাকেই পাঠাইত।

তিনটা বাজিয়া গেল। নীরজা রান্নাঘরে গিয়া, উনানে আঁচ দিয়া তরকারি কুটিতে বসিল। সন্ধ্যার আগেই রান্না-বান্না সব শেষ করিতে হইবে। নিরঞ্জন পাঁচটার পর আসিবে; সে তাহার আগেই ময়দা মাখিয়া রাখিবে এবং আসিলেই লুচি ভাজিয়া, দুই-একটা তরকারি যাহা তৈয়ারী হইয়া উঠিবে, তাহাই দিয়া খাইতে দিবে! অবশ্য এত সহজে স্বামীর রাগ ভাঙ্গিবে না; আসিয়াই জামা-কাপড় ছাড়িয়া বিধিমত শুইয়া পড়িবে। আদর করিয়া, আবদার করিয়া, কাতুকুতু দিয়া, দরকার হইলে পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গিতে হইবে। যদি তাহাতেও না ভাঙ্গে, নীরজা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিবে, আমি মেয়েমানুষ, তার উপর ছেলে-মানুষ, (এখন অবশ্য আর ছেলেমানুষ নয়, বয়স ত্রিশ পার হইতে চলিয়াছে, তবু নিরঞ্জনের তুলনায় তো বটে) আমার কিই বা বুদ্ধি, তাই বলিয়া তুমিও অবুঝ হইবে? তারপর ধরা গলায় বলিবে, তুমি কি একাই উপবাসী আছ? আমি যে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দিই নাই! তারপর চোখে অঞ্চল দিয়া বলিবে, আসিবে না তো? বেশ। —বলিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলেই নিরঞ্জন শুধু উঠিয়া আসিবে না, উল্টা আদর করিয়া তাহারই অভিমান

ভাঙ্গিবে। হয়তো খাওয়ার সময়ে নিজেরই সঙ্গে তাহাকে টানিয়া বসাইবার চেষ্টা করিবে! স্বামীর এসব বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান কম কিনা! ভাবে, ছেলেমেয়েরা এখনও তেমনই ছোট আছে। এদিকে টুনি যে কত বড় হইয়াছে, সব বুঝিতে শিখিয়াছে, তাহা মনে থাকে না। অবশ্য একটু ইঙ্গিত করিলেই বোঝে।

টুনি আসিয়া রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া কহিল, মা, কিছু খেলে?

গম্ভীর মুখে নীরজা কহিল, বলিস কি? এত সকাল সকাল জিজ্ঞাসা করছিস?

টুনি লজ্জিতভাবে কহিল, বাঃ রে। তখনই তো বললাম, খাও। তুমিও তো বললে, বাবা না খেলে কিছু খাব না। তারপর রান্নাঘরে ঢুকিয়া মায়ের সামনে বসিয়া কহিল, বাবা কখন আসবেন মা?

নীরজা পূর্ব্ববৎ জবাব দিল, রোজ যখন আসেন, তখনই আসবেন। রাগ ক'রে কিছু খান নি ব'লে সাহেব তো তাড়াতাড়ি ছাড়বে না।

কাছেই একটা ঝুনা নারিকেল পড়িয়া ছিল। টুনি আবদারের স্বরে কহিল, মা, নারকোলটা ভাঙব?

ভাঙ!

আমি জলটা খাব কিন্তু।

সবটা খাস নি, টুকু ভালবাসে, ওর জন্যে একটু রাখিস।

টুনির নারিকেল ভাঙ্গিবার উৎসাহ বোধ হয় কমিয়া গেল। নারিকেলটা পাশে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, জ্যেঠাইমারা খেয়ে-দেয়ে যাবেন, ফিরতে রাত হবে কিনা।

নীরজা কহিল, বেশ তো, তুইও খেয়ে যাবি।

বাবা যদি তার আগে না ফেরেন?

এবার নীরজা মুখ তুলিয়া কহিল, বাবার সঙ্গে তোর কি?

টুনি মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, বাঃ রে! বাবা যদি ভাবেন, আমি সারাদিন না খেয়ে রইলাম, আর মেয়ে আমার নাচতে নাচতে থিয়েটার দেখতে গেলেন!

টুনির ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া নীরজার হাসি পাইল। হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, তা হ'লে যাস নি, গালে হাত দিয়ে ব'সে থাক।

টুনি সভয়ে কহিল, বাঃ রে! তুমি যে এই বললে, যাবি।

মৃদু হাসিয়া নীরজা বলিল, এখনও তো তাই বলছি।

টুনি নাকী সুরে কহিল, তবে যে আবার উল্টো গাইছ।

নীরজা এবার কিঞ্চিৎ কড়া গলায় কহিল, বিরক্ত করিস নি। ইচ্ছে হয় যাবি, না হয় যাবি না। রাতদিন ঘ্যানর ঘ্যানর করিস তো যাওয়া বন্ধ ক'রে দোব।

টুনি কাঁচুমাচু মুখে কহিল, বাঃ রে! আমি কি করলাম?

কোলের ছেলেটির কান্না শোনা গেল। নীরজা কহিল, যা দেখি, খোকা উঠেছে, আস্তে আস্তে ঘুম পাড়িয়ে দিগে যা। না হ'লে টুকু উঠে প'ড়ে তো খাই খাই ক'রে কোনও কাজ করতে দেবে না।

টুনি মায়ের কাছ হইতে সরিয়া পড়িবার একটা সুযোগ পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গেল। নীরজা সব তরকারি রান্না করিয়া ফেলিয়াছে। ময়দা মাখিয়া রাখিয়াছে, নিরঞ্জন আসিলেই গরম গরম ভাজিয়া দিবে। এখন বসিয়া বসিয়া ঘি-ভাতের জন্য চাউল বাছিতেছে। যেমন তেমন করিয়া তাড়াতাড়ি তৈয়ারি করিয়া দিতে হইবে, কারণ, টুনিকে খাওয়াইয়া বিদায় করিতে হইবে।

টুকু ইতিমধ্যে উঠিয়া আসিয়া তরকারি চাকিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। টুনি ছোট খোকাকে লইয়া দোতলায় জ্যেঠাইমাদের থিয়েটারে যাওয়ার কত দেরি খবর লইতে গিয়াছে।

নীরজা টুকুকে কৃত্রিম ধমকের সহিত কহিল, কেবল নিজের পেটের চিন্তা! বাবা মা যে সারাদিন কিছু খায় নি, তার জন্যে কোন চিন্তা নেই!

টুকু লজ্জিত মুখে মাথা নীচু করিল।

নীরজা স্মিতমুখে তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, তা মুখ নামিয়ে ব'সে থেকে কি করবি! বাবা আসছেন কি না দেখগে যা, রোয়াক থেকে নামিস নি কিন্তু। এলেই একেবারে ধ'রে নিয়ে আসবি।

টুকু ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

ছয়টা বাজিয়া গেল। গৃহকর্ত্তা আপিস হইতে ফিরিলেন এবং যথারীতি গলখাঁকারি দিয়া গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

নীরজা শুনিতে পাইল, টুকু প্রশ্ন করিতেছে, জ্যেতামশায়, বাবা এলেন না কেন?

জ্যেঠামশায় জবাব দিলেন, কি ক'রে জানব জ্যেঠামশায়? বোধ হয় কাজের ভিড়।

টুকু কহিল, ভিড়! ভিড় থাকলে বুঝি বাড়ি আসতে নেই?

জ্যেঠামশায় ছেলেকে যতটা না হোক, ছেলের মাকে শুনাইবার জন্য জোর গলায় কহিলেন, ভিড় মানে, বেশি কাজ আর কি! একটু পরেই আসবেন।

টুকু বুঝিয়া, আবার দৌড়িয়া গিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল।

নীরজা ভাবিতে লাগিল, নিরঞ্জন এখনও আসিল না কেন? তবে কি আপিস হইতেই টিউশনি করিতে চলিয়া গেল? না খাইয়াই? হয়তো আপিসে খাবার খাইয়াছে। পয়সা? যেখানে দশ টাকা ধার পাওয়া যায়, সেখানে চার আনা পয়সা পাওয়া যাইবে না? সে না খাইলে যে নীরজা খায় না, তাহা বোধ হয় ভাল করিয়াই জানে। তবু চলিয়া গেল? আগে কখনও তো এমন করে নাই! কেমন যেন দিন দিন হইয়া যাইতেছে! সত্যকার মায়া-মমতা কিছুই নাই, যতটুকু করে, দেখাইয়া করে। যৌবন গেলে সব মেয়েরই অদৃষ্টে এমনই ঘটে নাকি? ঘটিলেও সে কিন্তু বেশিদিন সহ্য করিবে না। বাটিতে করিয়া বিষ লইয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিবে, হয় যেমন ছিলে তেমনই হও, না হয় আমার মুখে ঢালিয়া দাও। আমি মরিলে আমার দাম বুঝিবে। যে আসিবে, সে যত রূপবতী গুণবতীই হউক, আমার মত তোমাকে ভালবাসিবে না, তোমার সংসার দেখিবে না, তোমার ছেলেমেয়েদের মানুষ করিবে না। ছেলে, মেয়ে, স্বামী, সংসার ছাড়িয়া নিজের মরণের চিন্তা করিতেই নীরজার চোখে জল আসিয়া পড়িল। চোখ মুছিয়া মনে মনে কহিল, এমনই পোড়া মেয়েমানুষের মন, যত কষ্টই হউক, যত হেনস্তাই হউক, কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। স্বামীরা বোধ হয় মেয়েদের মন বুঝিতে পারে, তাই এমনই ব্যবহার করে।

সাতটা বাজিয়া গেল। নীরজা সমস্ত কাজ সারিয়া গা ধুইয়া, চওড়া লালপাড় তসরের শাড়িটি পরিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিল এবং উঠানের এক পাশে বাঁধানো মঞ্চের অভাবে ভাঙা বালতিতে অধিষ্ঠিত তুলসীগাছটির সামনে প্রদীপটি রাখিয়া, গলায় অঞ্চল দিয়া ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া স্বামীর ও ছেলেমেয়েদের কুশল প্রার্থনা করিল। তারপর প্রদীপ হস্তে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া, দেওয়ালে টাঙানো মা-লক্ষ্মী পটের সামনে দাঁড়াইয়া, দেবীর ঠিক মুখের সামনে প্রদীপটি

কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিল এবং তারপর প্রদীপটি মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া আর একবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মা-লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে তাহার প্রাত্যহিক প্রার্থনা নিবেদন করিল, মা, সকলকে ভাল রাখ, মুখ তুলিয়া চাও, মাহিনা বাড়াইয়া দাও, টুনির জন্য একটি ভাল বর হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখ, যেন বেশী ছুটাছুটি করিতে না হয়—ইত্যাদি।

টুনি আসিয়া ডাক দিল, মা!

নীরজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি, সময় হয়ে গেছে বুঝি?

টুনি কহিত, হুঁ, কিন্তু বাবা যে এখনও এলেন না!

বোধ হয় একেবারে পড়িয়ে আসবেন, তুই খেয়ে নিবি চল।

টুনি খাইয়া-দাইয়া সাজিয়া-গুজিয়া থিয়েটার দেখিতে চলিয়া গেল। যাইবার আগে খুঁতখুঁত করিবার ভান করিয়া কহিল, না গেলেই হ'ত মা। বাবা এসে কি বলবেন।

নীরজা সস্নেহে কহিল, কিছু বলবেন না, তুই যা তো, আমি বুঝিয়ে দোব।

আটটা বাজিয়া গেল। নীরজা খাদ্য-দ্রব্যাদি ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া, যাহাতে ঠাণ্ডা না হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিল। তারপর রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিল। কোলের খোকাটি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। টুকু দিদির সঙ্গেই নৈশ-ভোজন সারিয়া লইয়াছিল। কিছুক্ষণ আবোল-তাবোল বকিয়া, বাবা আসিলে তাহাকে জাগাইয়া দিবার জন্য মাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া সেও ঘুমাইয়া পড়িল। নীরজা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত বাড়িটা প'ড়ো বাড়ির মত খাঁ-খাঁ করিতেছে। হিসাবী বাড়িওয়ালা-গৃহিণী দোতলায় একটা লণ্ঠন পর্য্যস্ত জ্বালিয়া রাখিয়া যান নাই। অন্ধকার ঘরগুলার দিকে তাকাইয়া নীরজার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। মনে হইল, যাহারা একদিন এই গৃহে বাস করিত, মৃত্যু যাহাদিগকে গৃহচ্যুত করিয়া শূন্যাশ্রয়ী করিয়াছে, জীবিতদের অনুপস্থিতিতে তাহারা হয়তো সব আসিয়া জড়ো হইয়াছে। নীরজা ঘরে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। পাশের বাড়িতে অন্য দিন এই সময় ছেলেরা পড়াশুনা করে; গৃহিণী ঝি ও চাকরদের তারস্বরে বারংবার আদেশ ও উপদেশ দেন; আজ কিন্তু কাহারও সাড়া নাই। উহারাও সপরিবারে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছে বোধ হয়। টুকুর একটি হাত ছোট খোকার

মুখের উপর পড়িয়াছিল; নীরজা হাতটি সরাইয়া দিয়া টুকুকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইয়া দিল। খোকাকে একটু নাড়াচাড়া করিল; খোকা কাঁদিয়া উঠিলে নীরজা আশ্বস্ত হইল। আজ নীরজার গা-ছমছম করিতেছে কেন, কে জানে! এমন তো কোন দিন হয় নাই! নিরঞ্জনের চেয়েও নীরজা সাহসী, কতদিন একলা এ ঘরে কাটাইয়াছে—আজই তো প্রথম নয়। সারাদিন খায় নাই বলিয়াই বোধ হয় এমন হইতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল, নিরঞ্জন সাজিতে বলিয়াছিল—ঠিক বিয়ের কনেটির মত। নীরজা উঠিয়া, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া, চিরুনি দিয়া চুল আঁচড়াইল; তারপর পরিপাটি করিয়া কবরী রচনা করিয়া, সীমন্তে সিন্দূর দিল। সভ্যক্রীত তরল আলতা দিয়া পায়ের পাতা দুইটি রাঙাইল; কপালে কাঁচকড়ার সোনালী টিপ পরিল; ট্রাঙ্ক খুলিয়া বিয়ের শাড়ি ও জামা বাহির করিয়া গুছাইয়া পরিল। তারপর যতগুলি অলঙ্কার ছিল—একে একে সবগুলি পরিয়া আয়নার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকাইয়া রহিল। সারাদিন উপবাসে মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে; তবু দেখিতে তো মন্দ লাগিতেছে না! একটু মুচকি হাসিয়া, চোখ দুইটি ঢুলঢুলে করিয়া, নীরজা ভাবিল, কই, একেবারে বিশ্রী তো নয়! অবশ্য যৌবনের সেই গনগনে আগুনের মত চোখ-ঝলসানো রূপ আর নাই, এত অত্যাচারে অবহেলায় স্বয়ং উর্ব্বশী-তিলোত্তমারও থাকিত না, তবু এখনও সেই রূপের ক্ষীণ আভা নিশান্তের আকাশে ম্লান জ্যোৎস্নার মত সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া আছে।

দশটা বাজিয়া গেল। নিরঞ্জন কি বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছে? কে জানে! এমন তো প্রায়ই করে না। তবে ছাত্রটি দুই-একবার ধরিয়া লইয়া গিয়াছে বটে। তাহা হইলে, এখনও আধ ঘণ্টা নীরজাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

নীরজা ধূপদানিতে একটি ধূপকাঠি পরাইয়া রাখিল, নিরঞ্জন আসিলেই জ্বালিয়া দিবে; চন্দন ঘষিল; নিরঞ্জনের বিয়ের কাপড়চোপড় বাহির করিয়া রাখিল। নিরঞ্জনকেও ঠিক সে দিনের মত সাজাইবে—পরনে গরদের জরি-পাড় ধুতি, গায়ে গরদের চাদর, কপালে নীরজার নিজের হাতে আঁকা চন্দন-লেখা। তারপর নিরঞ্জন যদি বুদ্ধি করিয়া মালা কিনিয়া আনে, তাহা হইলে এই নিস্তব্ধ নিশীথে ধূপ-ধুনা-সুরভিত আধ-আলো আধ-ছায়াময় কক্ষে তাহারা আবার নূতন করিয়া মালা-বদল করিবে।

মাদুর পাতিয়া আলগাভাবে বসিয়া, নীরজা নিরঞ্জনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

* * *

আপিসে পৌঁছিতেই আপিসের দরওয়ান নিরঞ্জনকে একখানি পোস্টকার্ডে লেখা চিঠি দিল। তাড়াতাড়ি চিঠির ঠিকানা ও প্রেরকের নাম দেখিয়া নিরঞ্জন চিঠিটি পকেটে রাখিয়া দিল। গৌরমোহনের চিঠি—টাকার প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়াছে, হয়তো কাঞ্চন সম্বন্ধে দুই চারিটা খবর দিয়াছে। কিন্তু আপিস বসিবার সময় উত্তীর্ণপ্রায়; কাজেই চিঠিটি সম্প্রতি পকেটস্থ করাই যুক্তিসঙ্গত; কাজের ভিড়টা কাটিলে অবসর মত পড়িলেই হইবে।

বেলা একটার পর কাজের চাপ কিছু কমিলেই নিরঞ্জন জলখাবারঘরে গিয়া চিঠিটি বাহির করিয়া পড়িল। গৌরমোহন লিখিয়াছে—নিরঞ্জনের প্রেরিত টাকা যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু যাহার জন্য টাকা, সে গতকল্য নারায়ণ-ব্রহ্মনাম স্মরণ করিতে করিতে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছে। টাকাগুলি দাহ-ক্রিয়া এবং গঙ্গায় অস্থি-প্রেরণ বাবদে সব খরচ হইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া যে কিরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহা ভাগ্যহীন গৌরমোহন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না, কারণ অর্থাভাব; অথচ কাঞ্চনের মত সতী-সাবিত্রীর নেহাৎ পক্ষে তিলকাঞ্চন-মতে শ্রাদ্ধ না করিলে গৌরমোহনকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে; পরন্তু গৌরমোহনের সামাজিক মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইবে। অতএব গ্রামের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান শ্রীমান নিরঞ্জন যদি অন্তত পঞ্চাশটি টাকা মনিঅর্ডার-যোগে পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে গৌরমোহন এই দায় হইতে কোনমতে উদ্ধার হইতে পারে। গৌরমোহন অতঃপর নিরঞ্জনের স্বগ্রাম ও গ্রামবাসিগণের কল্যাণবিধানকল্পে দীর্ঘায়ু লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছে যে, পত্রোত্তর ও মনিঅর্ডারের জন্য সে চাতকপক্ষীর মত চাহিয়া থাকিবে। পুনশ্চ-চিহ্ন দিয়া গৌরমোহন আবার লিখিয়াছে—কাঞ্চন মৃত্যুর সময়ে পুনঃ পুনঃ নিরঞ্জনের নাম করিয়াছে। অতএব, প্রাণাধিক ভ্রাতৃপ্রতিম নিরঞ্জন যেন টাকা পাঠাইতে অন্যথা না করে।

অদূরে আর একজন মধ্যবয়সী কেরানী বেঞ্চির উপর বসিয়া ডাবা-হুঁকায় তামাক টানিতেছিলেন। নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, কি ভায়া, কোন খারাপ খবর নাকি?

নিরঞ্জন শুষ্কমুখে কহিল, হ্যাঁ, আমার একটি আত্মীয়া মারা গেছে।

কেরানীটি হুঁকায় শেষ-টান টানিয়া প্রচুর ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ও কাসিতে কাসিতে কহিলেন, মৃত্যু-খবর যখন, চিঠিটা আর পকেটে পুরে কাজ নেই। ছিঁড়ে ফেলে দাও। নিরঞ্জন চিঠিটা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কেরানীটি জিজ্ঞাসা করিলেন, খুব নিকট-আত্মীয় নাকি?

চিন্তিত মুখে নিরঞ্জন কহিল, আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন।

প্রশ্ন হইল, বিয়ে হয়েছিল তো?

নিরঞ্জন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কেরানীটি বিরক্তিসূচক কণ্ঠে কহিল, ওই তো অন্যায়! মরবি তো বিয়ের আগেই মর না বাপু! সেই সব ধকল সইয়ে, খরচপত্র করিয়ে মরা!—বলিয়া তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর বে-আক্কেলী মৃত্যুর বিবরণ দিলেন।

নিরঞ্জন কোন কিছু জবাব না দিয়া মৃদু হাসিল।

আপিসে কাজ করিতে করিতে নিরঞ্জন কাঞ্চনের কথা ভাবিতে লাগিল। পৃথিবীতে সে শুধু কষ্ট সহিবার জন্যই আসিয়াছিল। বাবা অল্পবয়সে মারা গিয়াছিল, মামার বাড়িতে মামীদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া বড় হইল। তারপর এমন লোকের হাতে পড়িল, যাহার কাছে স্নেহ-ভালবাসা সুখ-শান্তি দূরে থাক, ভদ্র জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত পাইল না, পরিবর্ত্তে পাইল প্রচুর নির্য্যাতন। অথচ নিরঞ্জনের সঙ্গেই তো তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। নিরঞ্জন কাঞ্চনের মাকে কথাও দিয়াছিল। নিজের মায়েরও অমত ছিল না, শুধু বাবা টাকার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না বলিয়া বিবাহ হইল না। তাহার অসচ্ছল সংসারে নীরজা কত খুঁতখুঁত করে। ভাবে, বড়লোকের মেয়ে সে, তাহার বাবা কম টাকা খরচ করেন নাই, একটু ভাল করিয়া খোঁজ-খবর করিলে হয়তো কত ভাল লোকের হাতে পড়িত। আশাভঙ্গ-জনিত অসন্তোষের জন্যই বোধ হয় নীরজা রাতদিন কথায় কথায় কলহ করে, অশান্তির সৃষ্টি করে। অথচ কাঞ্চন তাহার সংসারে আসিতে পারিলে হয়তো কৃতার্থ হইয়া যাইত। পাড়াগাঁয়ের গরিবের মেয়েরা

কত অল্প আয়ে কুলাইয়া গুছাইয়া সংসার করে। কাঞ্চন হয়তো তাহাই করিত, সংসারে সাচ্ছল্য না থাকিলেও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হইত না।

আপিসের কাজ শেষ হইতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। সারাদিন না খাইয়া নিরঞ্জনের মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে, পেটের ভিতরে জ্বালা করিতেছে। জলখাবার-ঘরে ঢুকিয়া সে মাথাটা ধুইয়া ঢকঢক করিয়া কতকটা জল গিলিয়া লইল। তারপর বাহিরে আসিয়া একজন আলাপী পানওয়ালার কাছে ধারে এক পয়সার পান খাইল। উদর ও মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতেই আবার কাঞ্চনের কথা মনে পড়িল। বেচারা কাঞ্চন! পূজার ছুটিতে বাড়ি গেলে গৌরমোহন তাহাকে কাঞ্চনদের বাড়ি ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। কি বিশ্রী চেহারা হইয়া গিয়াছিল তাহার! কাঁচা সোনার মত রঙ কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; গায়ে মাংস বলিতে কিছু ছিল না, যেন একটা কঙ্কালের উপর মানুষের চামড়া কোনমতে লাগিয়া ছিল। যে মুখের পানে তাকাইয়া একদিন তাহার মন মোহগ্রস্ত হইয়াছিল, এখন তাহার দিকে তাকাইতে নিরঞ্জনের কষ্ট হইল। কাঞ্চন দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল, নিরঞ্জনকে দেখিয়া বলিয়াছিল, কখন এলেন? বসুন।—বলিয়া আসনের জন্য উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল। নিরঞ্জন বলিয়াছিল, থাক থাক, তোমাকে উঠতে হবে না, ব'স।—বলিয়া খালি মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িয়াছিল। কাঞ্চন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিয়াছিল, মাটিতেই বসলেন?

নিরঞ্জন বলিয়াছিল, তা হোক, ধুলো নেই, কাপড়ও ফর্সা নয়। কেমন আছ?

কাঞ্চন মৃদু হাসিয়াছিল। হাসিটি কাঞ্চন হারায় নাই। চেহারা দেখিয়া চেনা না গেলেও হাসি দেখিয়া চেনা গেল। কাঞ্চন কহিয়াছিল, ভালই। বউদি ভাল আছেন? ছেলেমেয়েরা? আনলেন না কেন? দেখতাম।

নিরঞ্জনের মনে পড়িল, যেদিন নীরজাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া দুইজনে পাশাপাশি ছানলা-তলায় দাঁড়াইয়াছিল, সামনের দিকে তাকাতেই নিরঞ্জন দেখিতে পাইল—কাঞ্চন দাঁড়াইয়া আছে। চোখে চোখ মিলিতেই কাঞ্চন মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। কাঞ্চন কি তখন তাহাকে ভালবাসিত? ভালবাসিলেও সেই ভালবাসা কি এত দুঃখের তাপে আমরণ বাঁচিয়াছিল? বোধ হয় না। নীরজাও তো তাহাকে একদিন ভালবাসিত। কোথায় এখন তাহার ভালবাসা? কর্পূরের

মত কোন্ দিন উড়িয়া গিয়াছে, এখন শুধু গন্ধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া সে ভালবাসার অস্তিত্ব ঠাহর করিতে হয়। এখন ছেলেপিলে ঘর-সংসার লইয়া নীরজা নিশিদিন এমনই মগ্ন হইয়া থাকে যে, তাহাকে আমল দিতেই চাহে না, অবশ্য দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে দেয়, খাওয়ার সময়ে সামনে বসিয়া 'এটা খাও' 'ওটা খাও' বলিয়া আদর-আপ্যায়নও করে, কিন্তু তাহা বোধ হয় ভালবাসার তাগিদে নয়, নেহাৎ চক্ষুলজ্জায়। যে চাকরি করিয়া রোজগার করিয়া আনিতেছে, তাহার একটু খবরদারি করা উচিত বইকি। কিন্তু চাকরি গেলে বোধ হয় নীরজা আর ঘরে টিকিতে দিবে না। না হইলে, সামান্য দশটা টাকার জন্য আজ সারাদিন তাহাকে খাইতে দিল না!

বল হরি, হরিবোল—

চমকিয়া উঠিয়া নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল, জনকয়েক লোক রাস্তা দিয়া একটা শব বহিয়া লইয়া যাইতেছে। শবটির সর্ব্বাঙ্গ মলিন চাদর দিয়া ঢাকা। মাথায় এলোচুলে ডগডগে সিঁদুর, পায়ে টকটকে আলতা—মেয়েমানুষ। কাহারও স্ত্রী নিশ্চয়ই। কাঞ্চনের মত কোন অভাগী হয়তো দুর্দ্দান্ত স্বামীর কবল হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। কিংবা হয়তো কোন ভাগ্যবতী স্নেহময় স্বামীর আনন্দোজ্জ্বল সংসারকে আঁধার করিয়া যাইতেছে। নীরজার কথা মনে পড়িল। সেও কি এমনই করিয়া কোন দিন পলাইবে নাকি? তাহার শরীরও তো ভাল যাইতেছে না। কতদিন ধরিয়া কত রকমের অসুখের কথা বলিয়াছে, সে কোন দিন কান দেয় নাই। নারীসুলভ মানসিক দৌর্ব্বল্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। নীরজা কত কাহিল হইয়া গিয়াছে আজকাল। পূর্ব্বের মত দেহের সে লাবণ্য নাই, কমনীয়তা নাই, ঔজ্জ্বল্য নাই। অমন পুরন্ত নিটোল মুখ শুকাইয়া লম্বাটে হইয়াছে, গায়ের দুধে-আলতা-গোলা রঙ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, কোমল মাংসল মসৃণ হাত দুইটিতে হাড় ও শিরা বাহির হইয়াছে। হইবে না কেন? ভোর হইতে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত কি পরিশ্রম তাহাকে করিতে হয়! এক মিনিট বিশ্রাম করিতে পায় না, কাহারও কাছে এতটুকু সাহায্য পায় না। সে নিজে প্রতিমাসে গোটাকয়েক টাকা আনিয়া দেওয়া ছাড়া সংসারের তো কোন কাজটি করে না। কেমন করিয়া সংসার চলিতেছে, কোন অভাব-অনটন হইতেছে কি না, কিছুই খবর রাখে না। সাধে কি নীরজা ঝগড়া করে? অনেক জ্বালায় জ্বলে বলিয়া

তাহার মেজাজ খারাপ হয়। তাহা ছাড়া ঝগড়া করে তো সংসারের মঙ্গলের জন্য, নিজের সুখ-সাধ বা বিলাসিতার জন্য তো নয়। এ দিক দিয়া তাহার মত স্ত্রী কয়জন বাঙালীর আছে? কোন দিন একটা ভাল কাপড় চায় নাই, একটা গহনা চায় নাই, বরং আবশ্যক হইলে বিক্রয় করিবার জন্য নিজের গহনা বাহির করিয়া দিয়াছে, এমন কি কোন দিন নিজে হইতে সিনেমা-থিয়েটার যাইতে চাহে নাই। সেই স্ত্রী যদি একজন অনাত্মীয়কে দশটা টাকা দান করার জন্য অনুযোগ করে, কলহ করে, সে কি অন্যায়? আজকার দিনটা যে এমন ভাবে কাটিবে, তাহাতে নীরজার কোন দোষ নাই, সব তাহার নিজের দোষ।

বউবাজারের মোড়ে আসিয়া পৌঁছাইতেই নিরঞ্জনের মনে পড়িল, নীরজা মালা কিনিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছে। অভ্যাসমত পকেটে হাত দিল, একটা পয়সাও নাই। নীরজার রাগের জন্য আজ তাহার কাছ হইতে সে পয়সা চাহিয়া লইয়া আসিতে পারে নাই। তবে কি করিয়া মালা কেনা হইবে? হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল, ও দিককার ফুটপাথে চারু ব্যস্তসমস্তভাবে চলিয়াছে। নিরঞ্জন হাঁক দিয়া ডাকিল, চারু! চারু বোধ হয় শুনিতে পাইল না। নিরঞ্জন তাহাকে ধরিবার জন্য দ্রুতপদে রাস্তা পার হইতে গিয়া হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী মোটর ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকে ধাক্কা দিল।

তারপর যথারীতি হৈ-হৈ হইল, লোক জড়ো হইল, পলায়নপর গাড়িটা হইতে চালক ও আরোহীকে টানিয়া নামানো হইল, তরুণ দর্শকেরা আস্তিন গুটাইয়া চালকের উদ্দেশ্যে আস্ফালন করিল, প্রৌঢ়েরা 'কাহারও দোষ নয় বাবা, ভাগ্যের দোষ' বলিয়া তাহাদের নিরস্ত করিল, এবং জনৈক কন্‌স্টেব্‌ল গম্ভীরভাবে গোঁফে তা দিতে দিতে ঘটনাস্থলে হাজির হইতেই সকলেই সরিয়া পড়িবার জন্য তৎপর হইল। কন্‌স্টেব্‌ল যে দুই-চারিজনকে টানাটানি করিয়া থামাইতে পারিল, তাহাদেরই সাহায্যে নিরঞ্জনের অচেতন দেহটিকে ধরাধরি করিয়া গাড়িতে চড়াইয়া মেডিকেল কলেজে লইয়া চলিল।

ঘণ্টা দুই পরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন দুই মেথর নিরঞ্জনের মৃতদেহ একটা হাতগাড়িতে চড়াইয়া টানিয়া লইয়া গিয়া শবাগারের হিম-শীতল

অপরিচ্ছন্ন মেঝের উপর আরও কতকগুলা বেওয়ারিশ শবদেহের মাঝে নামাইয়া দিয়া আসিল।

নীরজা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে সে—তাহার বিবাহের স্বপ্ন। শুভদৃষ্টির জন্য তাহার ও নিরঞ্জনের মুখ একটা চাদরে ঢাকিয়া দিয়া সকলে বলিতেছে, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দুজনে দুজনকে, লজ্জা ক'রো না। নীরজা প্রাণপণে তাকাইয়া আছে। কিন্তু একটি গাঢ়কৃষ্ণ যবনিকা নিরঞ্জনের মুখটিকে তাহার দৃষ্টিপথ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। শত চেষ্টাতেও নীরজা তাহা দেখিতে পাইতেছে না।

ফিরে পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে কুলায়ে শাবক ডাকে
ল'য়ে বারি ফিরে নারী—আঁধারে জগত ঘিরে
নাহি গেহ, নাহি কেহ শূন্য প্রাণ জীর্ণ দেহ,
তোমার মরণ-স্নেহ দাও দেব, দুঃখিনীরে!

—অক্ষয়চন্দ্র বড়াল

সমাপ্তি

কাল—১৩৫০ সাল; আষাঢ় মাসের শেষাশেষি

সকাল, বেলা আটটা। বিমলা বউ ভিজা কাপড়ে সপসপ শব্দ করিতে করিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষে জল-ভরা মাটির কলসী। ভিজা কাপড় আঁট হইয়া গায়ের এখানে সেখানে লাগিয়া আছে; সিক্ত চুলের রাশি ঘাড়ের পাশ দিয়া বুকের উপরে লুটাইতেছে; কপালে কপোলে চিবুকপ্রান্তে জলবিন্দু মুক্তার মত টল টল করিতেছে।

বিমলা বউ উঠানের মাঝখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। উঠানের এক-পাশে তাহার মামী-শাশুড়ী মাতঙ্গিনী ও বাবুদের ঝি ক্ষীরোদা মুখামুখি দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই চুপ করিয়া গেল। বিমলা তাহাদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল; তারপর উঠানে পদচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

পাশের ঘরে মাতঙ্গিনীর স্বামী অঘোর টানিয়া টানিয়া কাসিতেছিল। আজীবন কাসরোগে ভুগিয়া দেহ তার জীর্ণ ও শীর্ণ; ছানি পড়িয়া চক্ষু দুইটি দৃষ্টিহীন; কানেও ভাল শুনিতে পায় না; নড়িতে-চড়িতে পারে না; সারাদিন নিজস্ব দড়ির খাটিয়াটির উপরে বসিয়া অথবা শুইয়া থাকে, আর কাসে।

একপর্ব্ব কাসি শেষ করিয়া ডাক দিল অঘোর, বউমা, অ বউমা, শুনছ! কেহ কোন জবাব দিল না। আবার কাসি স্থরু করিল অঘোর; টানের গলাতেই ডাকিল, বউমা, অ বউমা! মাতঙ্গিনী ধারালো গলায় চীৎকার করিয়া কহিল, 'বউমা, বউমা' ব'লে হামলাচ্ছ কেন? কি চাই বল না? অঘোর কহিল, গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, একটু চা—মাতঙ্গিনী ধমকাইয়া কহিল, দুবেলা ভাত জোটে না, চা খাবার সাধ! কোথায় পাবে চা? অঘোর কহিল, আছে আছে—বউমার কাছে, বউমা কোথায় গেল বল না! ও বউমা!

বিমলা কাপড় ছাড়িয়া ভিজা কাপড়খানি বাহিরে আনিয়া নিংড়াইল, তারপর উঠানে একটা দড়ির উপর টাঙাইতে লাগিল। মাতঙ্গিনী হাঁকিয়া কহিল, ও বউমা, শুনছ ?

বিমলা তখন শুনিতে পায় নাই এমনই ভাবে কাপড়টা এদিক-ওদিক টানিয়া ভাল করিয়া মেলিয়া দিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনী কহিল, কালা হয়েছ নাকি বউমা! শুনতে পাচ্ছ না ?

বিমলা কহিল, পাব না কেন ? বলুন না কি শুনতে হবে ?

বাবুদের বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে যে। কাল না হয় শরীর খারাপ ছিল ব'লে গেলে না—। বিমলা কহিল, আজও যেতে পারব না ব'লে দিন।

ক্ষীরোদা খনখন করিয়া কহিল, আজ না গেলে চলবে কেন ? কাল বড়গিন্নীর মহলে কোন রকমে চ'লে গেছে। দিন দিন তো তা হয় না! এক-আধজন নয়, ঝি-চাকর নিয়ে এতগুলি লোক! অঘোর হাঁক দিল, ও বউমা, শুনছ ?

যাচ্ছি, মামাবাবু।—বলিয়া বিমলা অঘোরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

অঘোর খাটের উপর উবু হইয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া ছিল। বিমলা কাছে গিয়া উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছেন ? অঘোর কহিল, একটু চা ক'রে দিতে পার, আছে ঘরে ? বিমলা কহিল, আছে, চিনি নেই কিন্তু। অঘোর কহিল, তা হোক, নুন দিয়েই ক'রে দাও একটু।

বিমলা রান্নাঘরে ঢুকিয়া একটা লোহার হাতা হাতে করিয়া বাহিরে আসিল।

ক্ষীরোদা কহিল, যাবে কি না ঠিক করে বলে দাও বাপু, বেলা হয়ে যাচ্ছে, না যাও তো অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, তবে এ কথা ব'লে দিচ্ছি, আজ না গেলে ও-বাড়িতে আর ঢুকতে হবে না তোমাকে।

ক্ষীরোদা নাপিতের মেয়ে, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, বালবিধবা, অল্প বয়স হইতেই বাবুদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করিতেছে সে, কায়মনোবাক্যে বাবুদের সেবা করিতেছে। এখন সে বড়বাবুর রুগ্না গৃহিণীর খাস দাসী। কথার সুরে নিজের পদমর্য্যাদা ফুটাইয়া তুলিল সে।

বিমলা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া কঠিন মুখে কহিল, ব'লে দিচ্ছি তো, আমি আর কাজ করব না, বলগে বাবু গিন্নীকে, অন্য লোক দেখুন তাঁরা।—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্ষীরোদা স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিমলা তাহার মুখের উপর এমন করিয়া সাফ জবাব দিবে, সে আশা করে নাই। যাহাদের মাথার চুলটি পর্য্যন্ত তাহার মনিবের কাছে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহার মনিব খাইতে না দিলে যাহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতে হইত, এই বাড়িতে থাকিতে না দিলে যাহাদিগকে গাছতলায় আশ্রয় লইতে হইত, তাহাদের বাড়ির বৌ হইয়া বিমলার এত অহঙ্কার! তাহারও রূপ-যৌবন একদিন ছিল, কিন্তু কোন দিন বাবু কি গিন্নীর সামনে মুখ তুলিয়া টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে নাই। গরিবের আবার তেজ! আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল ক্ষীরোদার। মুখ তোলো হাঁড়ি করিয়া ভারী গলায় কহিল, বেশ তাই বলিগে। বাঁকা-হাসি হাসিয়া কহিল, বাবুদের আবার লোকের অভাব। যা খরচ করছেন তোমার বউয়ের পেছনে, তার অর্দ্ধেক খরচ করলে কত ভাল লোক আসবে। ও-পাড়ার গাঙ্গুলী-বুড়ী তার নাতনীর জন্যে কতদিন থেকে ঝোলাঝুলি করছে। তবে তোমার বউটির ছিমছাম চেহারা, রাঁধতে বাড়তে জানে, সহবৎ ভাল, তাই গিন্নীর ওকে পছন্দ। তা যখন যাবেই না, তখন গাঙ্গুলী-বুড়ীর নাতনীকেই ডেকে আনিগে।

মাতঙ্গিনীও মুখরা কম নয়, নাপতিনী মাগীর কথার ঢঙ দেখিয়া তাহারও গা জ্বলিয়া গেল। তবু মেজাজের রাশ টানিতে হইল তাহাকে। নরম গলায় কহিল, আজকের দিনটা দেখ্ মা ক্ষীরোদা। কি রমক বেহেড মেয়ে দেখলি তো! দমদম ক'রে পা ফেলে সামনে দিয়ে চ'লে গেল! আমাকে গেরাহ্যি করে না মোটেই। ওকে একটু মানসম্ভ্রম করে, ওকে দিয়েই বলাব।

ক্ষীরোদা কহিল, আজ রাঁধবে কে তা হ'লে? মাতঙ্গিনী কহিল, আজ না হয় আমিই গিয়ে চালিয়ে দিই। ক্ষীরোদা কহিল, পাগল হয়েছ নাকি? ওই তো তোমার দেহ! নড়তে-চড়তেই চার পহর, এত বড় সংসারের যজ্ঞি চালানো কি তোমার কাজ? তা ছাড়া তোমার বউ যদি কাজ না-ই করে, আমাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো।

ব্যবস্থা কি, তাহা মাতঙ্গিনীর বুঝিতে বাকি নাই। দুই বেলা তাহাদের দুই-জনের জন্য ভাত আসে বাবুদের বাড়ি হইতে, তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে; এই বাড়ি হইতেও তাহাদের চলিয়া যাইতে হইবে। পৃথিবীতে আপনার বলিতে তাহাদের এমন কেহই নাই, থাকিলেও তাহাদের অবস্থা এমন সচ্ছল নহে যে, কেহ এই

দুর্দিনে দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন দিয়া দুই দিনের জন্যও সাহায্য করিবে, দুই দিনের জন্যও মাথা গুঁজিয়া থাকিবার জন্য আশ্রয় দিবে।

তখন চলচ্ছক্তিহীন অন্ধ স্বামীকে লইয়া এই বয়সে যে কি করিবে, কোথায় যাইবে, তাহা এক ভগবান ছাড়া আর কেহ জানে না। মাতঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, ও মেয়েমানুষ নয় ক্ষীরোদা, রাক্ষুসী। নিজেদের ছেলেমেয়ে ছিল না, ভাগনেকেই ছেলের মত মানুষ করেছিলাম। মানুষ হ'ল, দু-পয়সা আনতে শিখলে, অমনই কোথা থেকে রাক্ষুসী এসে গপ ক'রে গিলে খেয়ে দিলে। তাতেও ক্ষিদে মেটে নি রাক্ষুসীর, আমাদের দুজনকে খাবার জন্যে নোলা লসকস করছে ওর।

বিমলা হাতায় করিয়া আগুন লইয়া আসিল। আসিতেই মাতঙ্গিনী কহিল, হ্যাঁ গা বউমা, বাবুদের বাড়ির চাকরি করবে না কেন, বল দেখি? কি হ'ল তোমার? আমরা উপোস দিয়ে ম'রে যাই, এই কি তোমার ইচ্ছে?

বিমলা থামিয়া কহিল, দু মাস তো করলাম, আর আমি পারব না। ধারালো কণ্ঠে মাতঙ্গিনী কহিল, কেন পারবে না শুনি? কার কাছে সাহস পেয়েছ যে, রাজরাণীর মত মেজাজ তোমার?

বিমলা কহিল, আমার শরীর ভাল নেই।

মাতঙ্গিনী শ্লেষের স্বরে কহিল, কেন? কি হয়েছে তোমার? বাবুদের বাড়ির ভাত গিলে গতর তো দিন দিন ফুলছে তোমার, খারাপ তো কিছু দেখছি না।

বিমলা নীরস কণ্ঠে কহিল, খেতে তো আপনিও কসুর করেন না, গতরও আপনার কম নয়, করুনগে আপনি, আমি পারব না।

মাতঙ্গিনী বোমার মত ফাটিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, চুপ কর্ হারামজাদী! মুখের ওপর জবাব দেয়, এত বড় বাড়! আমার বাড়িতে মাথা গুঁজে আছিস, মনে নেই! সাতসকলি সক্কলকে তো খেয়ে ব'সে আছিস, আমি ঠাঁই না দিলে কোন্ আঘাটায় মরতিস তার ঠিকানা নেই।

অঘোর চীৎকার করিয়া কহিল, ও বউমা, চা চড়ালে? গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

মাতঙ্গিনী হাঁক দিয়া কহিল, চা নয়, তোমার পিণ্ডি চড়াবার ব্যবস্থা করছে, অনেক কষ্টে ভাগনেকে মানুষ করেছিলে যে, তার শোধ দেবে না!

অঘোর রাগতকণ্ঠে কহিল, ধুমসীর নিজে কিছু করবার ক্ষ্যামতা নেই, সব কাজে বাগড়া!

ক্ষীরোদার মুখে স্পষ্ট ও বিমলার মুখে অতি ক্ষীণ হাসির আভা খেলিয়া গেল।

মাতঙ্গিনীর দেহটি বেঁটে, খাটো ও মোটা। কালো রঙ। নিতম্বে ও বক্ষে মাংসের স্তূপ। ছোট-ছোট হাত-পা; টেবো-টেবো গাল দুইটি তোবড়াইয়া নাকের গোড়া হইতে ঠোঁটের দুই পাশ দিয়া দুইটি গভীর খাঁজ পড়িয়াছে। মাথায় এক মুঠো চুলে বড়ির মত ঝুঁটি।

একবার ক্ষীরোদার, একবার বিমলার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, মুখে আগুন তোমার! আমি ছাড়া এতদিন কে করেছে তোমার? বেশ তো, থাক তোমার রূপসী বউকে নিয়ে, আমি চ'লে যাব ভাইয়ের কাছে।

অঘোর কহিল, ভাই রাজা লবকেষ্ট কিনা! লোকের বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলে। নিজে খেতে পায় কিনা ঠিক নেই, বোনকে খাওয়াবে!

বিমলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই মাতঙ্গিনী কড়া গলায় কহিল, চ'লে যাচ্ছ যে? জবাব দিয়ে যাও।

বিমলা ভুরু দুইটা কুঁচকাইয়া কহিল, বললাম যে, চাকরি করব না। মাতঙ্গিনী কহিল, তোমার বাবা করবে। বিমলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, বেশ। বাবাকেই ডেকে আনুনগে, আমি করব না।

মাতঙ্গিনী হাত-মুখ নাড়িয়া কহিল, একশো বার করতে হবে তোমাকে; তোমার স্বামীকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছিলাম আমরা, তার ধার তোমাকে শোধ করতে হবে। বিমলা নীরসকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, করেছি তো এতদিন। নিজের গয়না-গাঁটি যা ছিল দিয়েছি, স্কুল থেকে যা পেয়েছিলাম দিয়েছি, দু মাস পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করেছি, আর আমি পারব না, এবার রেহাই দিন আমায়।

মাতঙ্গিনী নীরবে কিছুক্ষণ বিমলার দিকে ড্যাবড্যাব করিয়া তাকাইয়া রহিল। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া, উপরে নীচে মাথা নাড়িয়া কহিল, ওঃ! বুঝেছি তোমার মতলব। ওই কায়েত ছোঁড়া তোমাকে এই সব বুদ্ধি দিয়েছে। তাই

এত আনাগোনা, এত সলা-পরামর্শ। আসুক ছোঁড়া একবার, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব।

বিমলা কহিল, তা দেবেন বই কি, নতুন কাপড় এনে পরিয়েছে যে।

মাতঙ্গিনী কহিল, দরদে ম'রে যাচ্ছ যে! সে কি ওর বাবার ঘর থেকে দিয়েছে? সরকারের কাপড়।

ক্ষীরোদা চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, ঠিক বলেছ খুড়ী। ছেলেটা ভারি বজ্জাত। কাজ-কম্ম নেই, ধম্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভদ্দরনোকের ছেলে হয়ে ছোটনোকদের সঙ্গে কারবার। বাউরী-বাগদীদের ছুঁড়ীগুলোকে—

বাধা দিয়া বিমলা তীক্ষ্ণকণ্ঠ কহিল, ক্ষীরোদা, তুমি আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? যা বলবার ব'লে দিয়েছি, বাড়িতে গিয়ে অন্য ব্যবস্থা করতে বলগে। মাতঙ্গিনী কহিল ওকে আমিই থাকতে বলেছি। তোমাকে না নিয়ে যাবে না ও।

বিমলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমি কিছুতেই যাব না, ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে অনেক দূর এগিয়েছি, আর যাবার সাধ্যি নেই আমার।

ওষ্ঠ ও অধর সংযোগে অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, ভদ্দরনোক! ভদ্দরনোকের মেয়ে হ'লে ও কথা মুখে আনতে না তুমি।

বিমলা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, কি এমন কথা মুখে এনেছি আমি?

মাতঙ্গিনী কহিল, ওই যে বললে, ঘর ছেড়ে চ'লে যাবে কায়েত ছোঁড়াটার সঙ্গে।

পরম বিস্ময়ে বিমলা কহিল, ওই কথা বললাম আমি?

বলেছ বইকি। ক্ষীরোদা নিজের কানে শুনেছে।

ক্ষীরোদা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা তুমি বলেছ বউ।

বিমলা উত্তপ্ত স্বরে কহিল, মিথ্যেবাদী তোমরা।

মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া কহিল, কি! মিথ্যেবাদী আমরা। মুখ সামলে কথা বল বউমা, মুখে কুঠ হয়ে যাবে। ক্ষীরোদা খনখন করিয়া কহিল, ক্ষীরি নাপতিনী মিথ্যে কথা বলে, স্বয়ং বেহ্মা এসে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

মুখ লাল করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলা কহিল, কায়েত ছেলেটির নাম পর্য্যন্ত করি নি আমি, তোমরাই ওর কথা তুলেছ। তবে চ'লেই যাব আমি, এখানে থাকব না, চাকরি যদি করতে হয় তো শহরেই করব।

দুই চোখ বড় বড় করিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, কি বললে? শহরে চাকরি করতে যাবে? শুনছিস ক্ষীরোদা? শোন্ কথা? বলি নি তোকে, ওর পাখা গজিয়েছে, উড়বে ও। উচ্চকণ্ঠে হাত নাড়িয়া কহিল, চাকরি নয়, বেউশ্যেগিরি করতে যাবে তুমি। ছোটনোকের মেয়ে! লজ্জা-শরমের মাথা একেবারে খেয়েছ! বলতে একটুও বাধল না মুখে, মর, মর তুমি। বিমলা রান্নাঘরের দিকে যাইবার উপক্রম করিতেই মাতঙ্গিনী কহিল, খবরদার! রান্নাঘরে ঢুকবে না তুমি, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। বাহিরের দরজার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, বেরিয়ে যাও এখনই। বিমলা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে অপমানে মুখ সিন্দূরের মত টকটকে লাল হইয়া উঠিল, একবার কি বলিবার চেষ্টা করিল, তারপর কিছুই না বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

মাতঙ্গিনী কহিল, এক পা নড়বে তো ভাইদের মাথা খাবে তুমি। বিমলা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাতঙ্গিনী বলিতে লাগিল, আমার ঘরে বাস ক'রে এত বড় বাড় তোমার! গাঁয়ে মানুষ নেই ভেবেছ? বাবুদের বাড়িতে খবর দিয়ে, কাছারির সামনে দাঁড় করিয়ে, ছোটনোক দিয়ে জুতো মারাব তোমাকে।

বিমলা একদৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মাতঙ্গিনী কহিল, ছুঁড়ী তাকাচ্ছে দেখ, যেন কালসাপিনী। ওই চাউনিতে স্বামীকে খেয়েছে, এর পর আমাদের খাবে; সিঁজড়ে কানা ক'রে দোব ওই চোখ।—বলিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী বাড়াইয়া থপথপ করিয়া চলিল বিমলার দিকে।

হঠাৎ হোঁচট খাইয়া হুমড়ি দিয়া পড়িল মাতঙ্গিনী। হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ভাগিনেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিয়া কহিল, ওরে সাধন রে, দেখে যা বাপ, তোর কালনাগিনী বউ আমাদের মুখে লাথি মেরে কুলে কালি দিতে যাচ্ছে রে।

বিমলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল, একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

ক্ষীরোদা হাসি চাপিতে চাপিতে মাতঙ্গিনীর কাছে আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইল।

এমন সময়ে ঠকঠক করিয়া লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে, প্রসারিত বাম করতল কপালের উপর লম্বভাবে রাখিয়া, দৃষ্টিহীন চোখ দুইটা যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া, এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে আসিল অঘোর; উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল, কি হ'ল, কি হ'ল তোমার? দিনরাত ঝগড়া! বউমা কোথায়? বউমা!

মাতঙ্গিনী অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিল, মরেছে তোমার বউমা। অঘোর কহিল, কি? মেরেছে তোমাকে বউমা? কই সে? ক্ষীরোদাকে বিমলা ভাবিয়া কহিল, সকাল থেকে দশবার বললাম, চা কর, তা না ক'রে কোঁদল শুরু করেছ! কি মনে করেছ তুমি? শাশুড়ীকে মার! এত বাড় তোমার! মাতঙ্গিনী অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, কাকে কি বলছ? ও বউমা নয়, বাবুদের ঝি ক্ষীরোদা। অঘোর বিরক্ত হইয়া কহিল, ক্ষীরোদা কিসের জন্য এসে ব'সে আছে? বউমা কই? ক্ষীরোদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অঘোরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চেঁচাইয়া কহিল, বউকে ডাকতে এসেছি, সকালে কাজে যায় নাই যে। অঘোর চোখ দুইটি বার কয়েক মিটমিট করিয়া কহিল, কাজে যায় নি? কেন? কি হয়েছে বউমার? মাতঙ্গিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কহিল, তোমার বউয়ের পাখা গজিয়েছে, উড়বে এবার। ক্ষীরোদা বলিল, 'কাজ করব না' বলছে। মাতঙ্গিনী কহিল, 'ঘর ছেড়ে চ'লে যাব' বলছে। ওই যে কায়েতদের ফটকে আসে, তোমার জন্যে চা আনে, বিড়ি আনে, ওরই সঙ্গে 'পালিয়ে যাব' বলছে। অঘোর উচ্চকণ্ঠে কহিল, কি বলছ? ফটকে চা আনে ব'লে পালিয়ে যাবে? কি হ'ল তার? মাতঙ্গিনী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, আমার মরণ হয় না কেন বল্ দেখি ক্ষীরোদা? ক্ষীরোদা কহিল, তোমার বউমা ফটকের সঙ্গে পালিয়ে যাবে।

অঘোর দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কি! বউমা পালিয়ে যাবে? যাক দেখি, ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া ক'রে দোব না। কান কালা হয়ে গেছি ব'লে ভাবছে, ম'রে গেছি। ডাক তো তাকে, দেখি একবার—

মাতঙ্গিনী কহিল, আমাকে কুকুর-বেরালের চেয়েও অধম মনে করে; না হ'লে প'ড়ে গেলাম, কোথায় পরের মেয়ে এসে ধরলে, আর ও চোখে দেখেও ঠ্যাকার ক'রে চলে গেল! হঠাৎ আকাশের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া কহিল, হে চন্দ্র-সূয্যি, তোমরা সব দেখছ। অহঙ্কারের যেন পতন হয়, দুটি চক্ষের যেন মাথা খায়। যে গতরের গরবে মাটীতে পা পড়ে না, সে গতরে যেন আগুন লাগে।

অঘোরকে ঝাঁকানি দিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, শুনছ, তুমি ডেকে বলে দাও না! মাথা নাড়িয়া অঘোর কহিল, দোব বইকি। বউমা! শোন দেখি একবার।

উঠানের একপাশে রান্নাঘর, ঘর নয় কুঁড়ে, খড়ের চাল ; ছোট দরজা, জানলার বালাই নাই। চাল অনেকদিন ছাওয়া হয় নাই, এখানে সেখানে খড় খসিয়া গিয়া কাঠামো বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই সব ফাঁক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। বিমলা উনান ধরাইয়াছে নিশ্চয়।

অঘোর হাঁক দিয়া কহিল, বউমা, শুনতে পাচ্ছ না কি ?

মাতঙ্গিনী কহিল, নবাবের বেটী, গরিবের কথা কানে তুলবে কেন ?

ক্ষীরোদা রান্নাঘরের দরজার সামনে গিয়া ডাক দিয়া কহিল, ও বউ, এখানে এস না, তোমার শ্বশুর ডাকছে যে। বিমলা বাহিরে আসিল, ধোঁয়ায় মুখ লাল, চোখে জল।

কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাতঙ্গিনী অঘোরের শ্রবণ-সীমার মধ্যে কণ্ঠস্বর তুলিয়া কহিল, এসেছে, কি বলবে বলছিলে, বল।

অঘোর ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ, অঁ্যা! এত ডাকাডাকি করছি, কি মনে করেছ, অঁ্যা ?

বিমলা কহিল, চা করছিলাম। অঘোর একেবারে নিবিয়া গিয়া কহিল, চা করছিলে ? হয়েছে চা ? যাও দেখি, নিয়ে এস, গলাটা কাঠ হয়ে গেছে।

মাতঙ্গিনী কহিল, অঁ্যা মর! .চায়ের লালসেই গেলেন! কাছে আসিয়া কহিল, চা পরে খেও, আগে যা বলবে বলছিলে বল না!

অঘোর বিরক্তির স্বরে কহিল, জ্বালালে সকাল থেকে এই দুটোতে! বাঁচতে দেবে না আমাকে, সকাল থেকে এক ঢোক চা পড়ল না পেটে! কড়া গলায় বিমলাকে কহিল, বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে যাও নি কেন ? কাজ না করলে খাবে কি ? আমরা খাব কি ? অঁ্যা! যাও, চাটা ক'রে দিয়ে চ'লে যাও।

বিমলা কহিল, আমি যাব না। অঘোর কান পাতিয়া শুনিয়া কহিল, কি বলছ, অঁ্যা ? ভাল ক'রে বল না! ক্ষীরোদা কহিল, বলছে, যাবে না। অঘোর কহিল, আলবাৎ যাবে। যতদিন আমরা বাঁচব, ততদিন যেমন ক'রে হোক আমাদের খাওয়াবার দায় তোমার। তোমার শাশুড়ীকে আজীবন খাইয়েছি, পরিয়েছি, তোমার স্বামীকে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি ; সে বেঁচে থাকলে আমাদের খাওয়া-পরার ভাবনা থাকত না। তাকেই যখন খেয়ে ব'সে

আছ, তখন আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে তুমি ধর্ম্মত বাধ্য। না করলে, তোমাকে নরকে পচতে হবে।

লম্বা বক্তৃতা করিয়া অঘোর হাঁপাইতে লাগিল। বিমলা কহিল, মেয়েমানুষ হয়ে আমি কি ক'রে আপনাদের খাওয়াব? অঘোর কহিল, যা করছ তাই ক'রে, চাকরি ক'রে। এমন চাকরি তুমি কোথায় পাবে? নগদ দু টাকা ক'রে মাইনে, তার ওপর খাওয়া—তোমার, আমার, তোমার শাশুড়ীর। তিন-তিনটে লোকের খাওয়াতে আজকালকার বাজারে কত খরচ জান? কারও কান-ভাঙানি না শুনে চ'লে যাও; গাঁয়ের কত মেয়ে ওই চাকরির জন্যে ছুঁপিয়ে আছে, একবার ছাড়লে আর পাবে না।

বিমলা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষীরোদা কহিল, কি গো জবাব দাও? বিমলা কহিল, দিয়েছি তো, কতবার দোব? মাতঙ্গিনী হাত ও মাথা নাড়িয়া কহিল, ভবী ভোলবার নয়, সেই এক কথা। ফটকে ছোঁড়া ওর মাথা একেবারে খেয়ে দিয়েছে, আদায়-বস্তু কিছু নেই! ক্ষীরোদা অঘোরকে কহিল, শুনছেন, 'যাব না' বলছে। অঘোর মুখখানা কুঁচকাইয়া কহিল, কি হয়েছে তোমার বল দেখি? কেন যাবে না? মাতঙ্গিনী ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, কি হয়েছে বল দেখি? পেঁপুল পেকেছে—। বিমলা কহিল, বলেছি তো কতদিন, আমাকে অপমান করে বাবু; কাল অপমানের— বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিল বিমলা।

মাতঙ্গিনী ধমকের স্বরে কহিল, মুখ সামলে কথা ব'লো বউ। ভাল লোকের নামে মিথ্যে অপবাদ দিলে জিব খ'সে যাবে তোমার। শ্লেষের স্বরে কহিল, অপমান করেছে ওকে! ভূপতি রায় মেয়েমানুষ তো দেখে নি জীবনে, তাই ওর রূপ দেখে বেসামাল হয়ে গেছে।

ক্ষীরোদা গালে হাত দিয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল, ওমা! কি কথা! ভাল লোকের নামে মিথ্যে কুচ্ছো! দণ্ডবৎ তোমাকে, কাজ নাই তোমার কাজ ক'রে। বাবুকে বলিগে—

ব্যাকুলস্বরে মাতঙ্গিনী কহিল, যাস না মা ক্ষীরোদা, দাঁড়া।

অঘোর কহিল, কে অপমান করেছে? ভূপতি? ঘাড় নাড়িয়া কহিল,

বিশ্বেস হয় না। এত মেয়েমানুষ ও-বাড়িতে কাজ করে, কেউ কোন দিন টুঁ পর্য্যন্ত করে নি ওর নামে।

ক্ষীরোদা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সত্যি, আমি তো এতদিন কাজ করলাম, কোনদিন একটা বেয়াড়া রকমের চাউনি পর্য্যন্ত দেখিনি বাবুর। মাতঙ্গিনী কহিল, মিথ্যে কথা শুনিস কেন ওর? পেটে পেটে কত বিদ্যে আছে দেখ তোরা! সবাই বলে, কেন ঝগড়া হয় দিনরাত? অসৈরণ দেখতে পারি না, তাই হয়। অঘোর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও কেউ বিশ্বেস করবে না গাঁয়ে।

মাতঙ্গিনী কহিল, এসব ফটকে শিখিয়েছে, বুঝলে? এক ফোঁটা ছোঁড়া এই বয়েসে এত ফিচলেমি বিদ্যে!

অঘোর বলিতে লাগিল, আর যদি অপমান করেই তো সহ্য করতে হবে, বড়লোকেরা অপমান করেই। তা ছাড়া জমিদার ওরা, আমার বাপ পিতামহ ওদের বাড়িতে চাকরি করেছে চিরদিন; আমি যত দিন চোখ ছিল চাকরি করেছি। আমাদের অপমান করে নি? সহ্য করেছি মুখ বুজে। তোমাকে যদি অপমান করেই, সহ্য করবে, না হ'লে খাবে কি? থাকবে কোথায়? জমি-যায়গা, ঘর-বাড়ি সব বাঁধা ওর কাছে। দম লইয়া কহিল, চায়ের জলটা চড়িয়ে এসেছ বোধ হয়, ফুটছে এতক্ষণ, চাটা ক'রে দিয়ে কাজে যাও।

একজন বিধবা আসিয়া হাজির হইল, বয়স ষাটের উপরে। বাহিরের দরজা হইতেই বক্তৃতা শুরু করিল, কি হ'ল লো তোদের, অনেকক্ষণ থেকে গলা শুনতে পাচ্ছি যে? বিমলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বিধবার নাম মোক্ষদা, পাশেই তাহার বাড়ি। মাতঙ্গিনী সখেদে কহিল, আমাদের কথা আর ব'লো না ঠাকুরঝি! বিছুটির গাছ লাগিয়ে গেছে সাধন, তারই জ্বালায় জ্ব'লে মরছি আমরা।

মোক্ষদা ক্ষীরোদাকে কহিল, তুই এখানে? কি হ'ল লো? ক্ষীরোদা কহিল, আর ব'লো না পিসী! বউ কাজে যায় নি, ডাকতে এলাম তো বলে, যাব না, বাবু আমাকে অপমান করেছে।

মোক্ষদা জিভ কাটিয়া কহিল, ছি ছি! ও কি কথা! ভূপতির মত ছেলে ভূভারতে হয় না। রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যায় তো কারও মুখের দিকে তাকায়

পর্য্যন্ত না ; সেদিন যাচ্ছিল তো পাঁচবার ডাকতে তবে শুনতে পেলে ; বললে, পিসীমা, তুমি ডাকছ ? এমন ক'রে পিসীমা ডাকে যে শুনে মনে হয় না যে, নিজের ভাইপো নয়। তা শোন্ একটা কথা।—বলিয়া ক্ষীরোদাকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া যাইতেই মাতঙ্গিনী কহিল, যাস নে ক্ষীরোদা, বউকে সঙ্গে নিয়ে যাবি।

মোক্ষদা ফিসফিস করিয়া ক্ষীরোদাকে কহিল, এত পাঁচ কথার দরকার কি ? না যায়, না যাবে। লোকের ভাবনা কি ? আমার নগা শ্বশুর-বাড়ি থেকে চ'লে এসেছে ; সেখানে ভারি কষ্ট দেয় ওকে দিনরাত ; খাটে, খেতে পায় না ; ওকেই চাকরিটা ক'রে দে মা, তোর হাতে ধ'রে বলছি, মেয়েটা সত্যি ভারি ভাল, মুখে কথাটি নেই। মাতঙ্গিনী দুই চোখ ও কান একাগ্র করিয়া ইহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল, ভিতরে ভিতরে তাহার অস্থিরতার সীমা রহিল না।

বিমলা একটা পিতলের গ্লাসে করিয়া চা আনিয়া অঘোরকে দিল। অঘোর চা খাইতে খাইতে কহিল, এর পর চ'লে যাও ক্ষীরোদার সঙ্গে।

বিমলা কহিল, বাবু যদি নিজে এসে ব'লে যান যে আর অপমান করব না, তো যাব।

মাতঙ্গিনী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, বাবু তোমার বাবার জমিদারির প্রজা কিনা, তাই তোমার কাছে এসে খত লিখে দিয়ে যাবে।

মোক্ষদা কহিল, ওঃ, কি সাহস ! মানীর মান্যি করবি বউ, রূপ যৌবন চিরদিন থাকে না।

ক্ষীরোদা হেলিয়া দুলিয়া বিমলার কাছে আসিয়া কহিল, বাবুর খুব অপমান করেছ বউ। গলবস্ত্র হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, এর পর ক্ষ্যামা দাও, বাবুকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই, পায়ের কাছে নাকখৎ দিয়ে ক্ষ্যামা চেয়ে যাবেন এখনই। আবার তেমনই ভাবে চলিয়া মোক্ষদাকে কহিল, চল পিসী, চল।—বলিয়া দুইজনে বাহির হইয়া গেল।

মাতঙ্গিনী গলা ফাটাইয়া অঘোরের উদ্দেশ্যে কহিল, শুনছ ! চ'লে গেল ক্ষীরোদা, মুখী ঠাকুরঝির মেয়ে নগাকে নিয়ে গেল। এর পর খাবে কি ? কাল যদি ঘর থেকে বার ক'রে দেয় দাঁড়াবে কোথায় ? বিমলার দিকে তাকাইয়া কহিল, হতভাগী, মনের সাধ মিটল তো ? বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে উপোস করিয়ে মেরে

খুব স্ফূর্ত্তি হবে তোমার—তোমাকে বাড়িতে রেখে কি লাভ আমাদের? নিজের পথ তুমি দেখ এবার।

বিমলা জবাব না দিয়া চলিয়া গেল। অঘোর চা পান শেষ করিয়া গ্লাসটা নামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা বেহেড মেয়ে তুমি! এত ক'রে বললাম কানে গেল না? খাব কি আজ? কাল তো মুড়ী খেয়ে কাটিয়েছি। আজ ভাত না খেলে ম'রে যাব যে। এখনই খিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে আমার। ও বউমা, যাও না কাজে, বুড়ো শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়েও যাও।

বেলা এগারোটা। আষাঢ়ের রৌদ্র ইহার মধ্যেই বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছে। গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকদের করুণ প্রার্থনা কানে আসিতেছে—চারিটি ভিক্ষে দাও মা, একটু ফ্যান দাও গিন্নীমা। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীদের তিরস্কার, যা যা, নিজেরাই খেতে পাচ্ছি না, তোদের চাল দেবে। বাবুদের বাড়ি যা।

মাতঙ্গিনী মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, বাপের তুল্য শ্বশুরের কথা কানে তুললে না, এত তেজ! এ তেজ থাকবে না, ভগবান দমন করবেন, দুবেলা দু-মুঠো শুধু ভাত, আর কিছু না, তাও সহ্য হ'ল না গাঁয়ের হতভাগীদের? গরিবের ভাত-ভাঙ্গি যারা করলে, ভগবান যেন তাদের ব্যবস্থা করেন, ভাতের গেরাস যেন মুখে তুলতে না হয়। অঘোর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, চেঁচাস না মিছিমিছি। ঘরে ঘটি-বাটি কিছু আছে তো বাঁধা দিয়ে চাল নিয়ে আয়, পেট জ্ব'লে যাচ্ছে আমার।

বাহিরে দরজায় কাহার ডাক শোনা গেল, বউদিদি! একটি কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের ছেলে বাড়িতে ঢুকিল; লম্বা কাহিল চেহারা, শ্যামবর্ণ, কৈশোরের কোমল চিক্কণতা এখনও মুখ হইতে মিলাইয়া যায় নাই; আয়ত উজ্জ্বল চোখ, মাথায় রুক্ষ বড় বড় চুল; পরিধানে খদ্দরের কাপড়, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পা খালি।

বাঘিনীর মত বাহিরে আসিয়া মাতঙ্গিনী হাঁকিয়া কহিল, কে র‍্যা! ফটকে বুঝি! কটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, বেরিয়ে যা হতভাগা! খবরদার আর এ বাড়িতে আসবি নে বলছি, এলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব। হতভাগা, ছোটলোক হয়ে বামুনের ঘরের বউকে বার ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা!

ফটিক কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হাসিয়া কহিল, কি হ'ল খুড়ীমা ?

ন্যাকা ! কি হ'ল খুড়ীমা ! ওমা ! সাধনের কাছে পড়ত, বাড়ির ছেলের মত আসে ঘরে, কিছু বলতাম না। এইটুকু ছেলে, পেটে পেটে এত বিদ্যে তোর ! ও যে তোর বড় বোনের বয়সী রে !

ফটিক গম্ভীর হইয়া কহিল, কি যা-তা বলছেন খুড়ীমা ! কাকা কোথায় ? তাঁর জন্যে বিড়ি আর চা এনেছি।—বলিয়া পকেট হইতে বাণ্ডিল দুই বিড়ি ও এক প্যাকেট চা বাহির করিল।

হাত নাড়িয়া মাতঙ্গিনী কহিল, নিয়ে যা তোর চা-বিড়ি ; ভাতে ধূলো দিয়ে চা-বিড়ি খাওয়ানো ! বেরো, হতভাগা, বাড়ি থেকে। এ বাড়িতে আর পা দিস তো, তোকে মা কালীর দিব্যি, যাকে মানিস তার দিব্যি।

ফটিক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

বিমলা নিজের ঘরের মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছিল। দরজায় দাঁড়াইয়া মাতঙ্গিনী কহিল, দিলাম ছোঁড়াকে দূর ক'রে, তোকেও দোব। কেন থাকতে দোব তোকে ? তুই কে আমার ? যদি আমাদের দরদ করতিস, তোরও করতাম, আমাদের মুখের দিকে যখন তাকালি না, তোর মুখের দিকেও তাকাব না।

অঘোরের কাছে গিয়া মাতঙ্গিনী কাঁদিয়া কহিল, শুনছ ! ফটকে ছোঁড়া এসেছিল, দূর ক'রে দিলাম। বলে, চা-বিড়ি এনেছি কাকার জন্যে। কাকা !

অঘোর কহিল, বিড়ি-চা রাখলি না কেন ?

মাতঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া কহিল, ওর দেওয়া চা-বিড়ি খাবে তুমি ? লজ্জা করবে না ?

অঘোর গজগজ করিতে লাগিল, যত সব মেয়েমানুষের বুদ্ধি ! বিড়ি-চা এনেছিল, ফেরত দিয়ে দিলে ! বাঁচতে দেবে না আমাকে। পেটটা খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে, এক কাপ চা খেলেও পেটটা ঠাণ্ডা হ'ত।

বেলা তিনটা। বাগান-বাড়ির বারান্দায় জমিদার ভূপতি রায় একটা চেয়ারে বসিয়া ছিল, সদ্য দিবানিদ্রা সমাপ্ত করিয়াছে, মুখের ভাব থমথমে, চোখ লাল।

বিস্তৃত বাগান, চারিদিকে মেহেদিগাছের ঘন বেড়া। মাঝখানে ছোট একটা দীঘি, নাম রাধা-সাগর, রাধারাণী ভূপতির পিতামহীর নাম। দীঘির চারিটা

পাড়ই সমতল, উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে শাণ-বাঁধানো ঘাট, দক্ষিণ পাড়ে ঘাট হইতে কিছু দূরে চারিদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা গৃহদেবতা বিষ্ণুর মন্দির, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাড়ে বিস্তর আম লিচু আর নানা ফলের গাছ। উত্তর পাড়ে পাকা একতলা চার-কুঠুরি বাড়ি, সামনে টালির ছাওয়া টানা বারান্দা। একটা কুঠুরিতে কাছারি, আর একটাতে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস, ভূপতি বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ; আর একটাতে হাকিম-হুকিম আসিলে থাকেন ; আর একটাতে থাকে স্বয়ং ভূপতি। এই ঘরে দিবা-রাত্র থাকে ভূপতি, এইখানেই স্নানাহার ও দিবা-রাত্রির শয়নের ব্যবস্থা, কোন কোন রাত্রে খেয়াল ও মর্জ্জি হইলে গৃহে গৃহিণীর কক্ষে রাত্রি-যাপন করে।

ভূপতির বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, বেঁটে মোটা দেহ, রঙ ফর্সা, তবে পাড়াগাঁয়ে থাকার দরুন তামাটে রঙ ধরিয়াছে ; গোল ধরণের মুখ ; মাথার চুল মোটা ও পুরু, ঘাড়ের দিকটা কামানো, সামনে লম্বা টেরি। মুখের দাঁড়ি গোঁফ কড়া, তুইই মাঝে মাঝে কামায়। হাতে পায়ে বুকে ও পেটে চুলের আধিক্য। ছোট ছোট চোখের উপরে কেশবহুল ভ্রূ, মোটা নাক, মুখের ভাব রুক্ষ ও কর্কশ। ভূপতির পরিধানে মিহি ধুতি, গা খালি, কাঁধে ভিজা তোযালে, পায়ে চটিজুতা। আষাঢ়ের গুমট গরমে ভূপতি অবিরত অজস্র ঘামিতেছে ও ভিজা তোয়ালে দিয়া গা মুছিতেছে।

মাতঙ্গিনী সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিরক্ত-স্বরে ভূপতি কহিল, কে ?

মাতঙ্গিনী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, আমি বাবা—সাধনের মামী।

কি দরকার এখানে ?

মাতঙ্গিনী অনুনয়ের স্বরে কহিল, আমাদের ওপর রাগ ক'রোনা বাবা। বুড়োর অনুতাপের সীমা নেই, সারাদিন নড়বার চড়বার ক্ষ্যামতা নেই, আমিই এলাম তাই। ছেলের মত তুমি, তোমার কাছে আসতে তো লজ্জা নেই।

ভূপতি কহিল, ক্ষীরোদার কাছে সব শুনেছি আমি, অপমান আমার যা হবার হয়েছে ; আমার কাছে এলেই তার কি প্রতিকার আছে ?

বাবা, আমাদের কোন দোষ নেই। স্বামী-স্ত্রীতে হাজার বার বলেছি, এখনও বলছি, যা, বাবুর পায়ে ধ'রে ক্ষ্যামা চেয়ে কাজ করুগে যা। ভারি বেহেড মেয়ে বাবা, কোন মতে শুনছে না।

ভূপতি কড়া গলায় কহিল, থাক্ থাক্, আমাদের আর দরকার নেই মুখী বামনীর মেয়ে কাজে ঢুকেছে, রান্না-বান্না করে বেশ, বুড়ো-হাবড়াও নয়; ওকে দিয়েই চলবে। তা একটা কথা তোমার কর্ত্তাকে বলগে, বাড়ি থেকে উঠে যাবার ব্যবস্থা করতে। কালই গোমস্তাকে জেলায় পাঠাব নালিশ করতে, স্থদে মূলে অনেক টাকা হয়ে গেছে, অনেক দিন অপেক্ষা করেছি, আর পারব না।

মাতঙ্গিনী ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, আমাদের মেরো না বাবা! কদিনই বা বাঁচব আমরা, আমরা ম'লে সবই তোমার হবে।

কবে কে মরবে এত হিসেব করতে গেলে জমিদারি চলে না।

মাতঙ্গিনী দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, হেই বাবা ভূপতি? আমাদের ওপর বিরূপ হ'য়ো না বাবা! যেমন দু-মুঠো খেতে দিচ্ছ দাও, আর ওই ছুঁড়ীটাকে শায়েস্তা কর।

ভূপতি মাথা নাড়িয়া কহিল, খেতে-টেতে দিতে পারব না, শায়েস্তা করবারও আমার দরকার নেই।

মাতঙ্গিনী কহিল, না বাবা ভূপতি, ও কাজ ক'রোনা বাবা। আমরা ম'রে যাব তা হ'লে।

ভূপতি কহিল, মরবে কেন গো? সরকার লঙ্গরখানা ক'রে দিয়েছে, আমার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর না ক'রে সেখানে যাও। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমার এক কথা, এক মাসের মধ্যে বাড়ি তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

বাবুদের বেড়ের পাশে একটা প'ড়ো জমিতে খড়ের চালাঘর তুলিয়া লঙ্গরখানার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখান হইতে সমবেত ক্ষুধার্ত্ত জনতার কোলাহল কানে আসিতে লাগিল।

ভূপতিই লঙ্গরখানার মালিক। অর্দ্ধেক চাল-ডাল সে নিজের অনুগত ও অনুরক্ত লোকদের বিতরণ করে। তাহার দয়া হইলে এইখানেই সে মাতঙ্গিনীকে চাল ডাল দিতে পারে, না হইলে লঙ্গরখানায় গেলেও কেহ তাহাদের বসিতে দিবে না। তা ছাড়া ভদ্রঘরের মেয়ে-পুরুষ হইয়া লঙ্গরখানায় ছোটলোকদের চোখের সামনে একসঙ্গে খাইতে বসিবে কেমন করিয়া? দুর্ভিক্ষ চিরদিন থাকিবে না, কিন্তু এই কলঙ্কের দাগ আমরণ দপদপ করিতে থাকিবে। এমন করিয়া বাঁচার চেয়ে মরণই ভাল।

ভূপতি গলা ঝাড়িয়া কহিল, তোমাদের বউটির এত তেজ বাড়ল কি করে বলতে পার? মাতঙ্গিনী কহিল, ও এমন ছিল না বাবা! কায়েতদের ফটকেই ওর মাথা ঘুরিয়া দিয়েছে, বলে কিনা—ঘরে থাকব না, শহরে চাকরি করব।

ফটকেকে তো তোমরাই ঘরে ঢুকিয়েছ।

আমরা ঢোকাই নি বাবা, সাধন বেঁচে থাকতেই আমাদের ঘরে আসে, সাধনের কাছে পড়ত কিনা। কি ক'রে জানব বাবা, এমন বদ ছেলে।

গাঁয়ের সবাই জানে, আর তোমরা জান না? কানে তূলো দিয়ে বাস কর নাকি গাঁয়ে? যত গুণ্ডা বদমায়েশদের সঙ্গে ওর ভাব, বাউরী-বাগদীদের মেয়েদের সঙ্গে খারাপ কাণ্ড। থানার দারোগার খাতায় ওর নাম লেখা।

মাতঙ্গিনী গালে হাত দিয়া কহিল, ওমা! কি কথা! জানি না বাবা, কিছুই। আজকে এসেছিল, গাল দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছি, ঘরে আর আসতে মানা ক'রে দিয়েছি।

ভূপতি গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনী কহিল, আমাদের ভাতে মেরো না বাবা। ও ছুঁড়ীকে তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি; মার-ধর যা ইচ্ছে কর ওকে, আমরা কোন দিন টুঁ করব না।

ভূপতি কি ভাবিতে লাগিল। তাহার ঠোঁটে সূক্ষ্ম ক্রুর হাসি ফুটিল; চোখ দুইটা সাপের চোখের মত চকচক করিয়া উঠিল, দুই ঠোঁট লালসায় ও লোভে ছুরির ফলার মত বাঁকা হইয়া উঠিল।

মাতঙ্গিনী মিনতি করিয়া কহিল, হেই বাবা ভূপতি! লঙ্গরখানায় যেতে পারব না বাবা।

ক্রুর হাসি হাসিয়া ভূপতি কহিল, পারবে না কেন, শুনি? ছোটলোকদের সঙ্গে তোমাদের তফাত কিসের? একবেলার খাবার সংস্থান নেই। ওদের তবু মাথা গোঁজবার এক-একটা কুঁড়ে আছে, তোমাদের তাও নেই। ডিক্রী ক'রে, দখল নিয়ে যেদিন ঘর থেকে দূর ক'রে দোব, দাঁড়াবার জন্যে গাছতলাও থাকবে না তোমাদের। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বাউরী-বাগদীদের মেয়ে-পুরুষের কাছে তবু কাজ পাওয়া যায়, তোমাদের কাছ থেকে তাও পাওয়া যায় না। মিছামিছি কেন তোমাদের খেতে দোব, শুনি?

মাতঙ্গিনী কহিল, কাজ তুমি করিয়ে নাও বাবা, তোমার হাতেই তো সব ছেড়ে দিচ্ছি।

একটা চাকরকে ডাক দিয়া ভূপতি কহিল, এই! একে আধ সের চাল দিয়ে দে। মাতঙ্গিনীকে কহিল, শুধু তোমাদের দুজনের জন্যে দিলাম। বউটাকে এক মুঠোও খেতে দিও না। ওর রস একটু মরা দরকার, না হ'লে তেজ কমবে না, ওকে ভাল ক'রে বুঝোওগে যাও, যদি কালকের মধ্যে আমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে যায় তো ভাল, না হ'লে কোন কথা শুনব না। আর যদি আসে, ভালভাবে কাজকর্ম্ম করে, তো তোমাদের কোন অভাব রাখব না।

২

বেলা প্রায় চারটা। বিমলা তাহার ঘরে বসিয়া ছিল। আজ সারাদিন কিছুই খায় নাই। কাল রাত্রে দু'পয়সার মুড়ি খাইয়াছিল। পয়সা মাতঙ্গিনীই দিয়াছিল। তাহারই রোজগারের পয়সা। মাসে দুই টাকা করিয়া মাহিনা পায় সে। কিন্তু বাড়িতে আনিতে না আনিতেই মাতঙ্গিনী তাহা কাড়িয়া লয়। দিনে ও রাত্রে বাবুদের বাড়ি হইতে ভাত-তরকারী আসে। ঐ দুটি টাকা দিয়া তেল, নুন, কাঠ, মুড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করে মাতঙ্গিনী। কাল মাতঙ্গিনীর পয়সা দিবার ইচ্ছা ছিল না। নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে দিয়াছিল। আজ এত কলহের পর তাহার কাছ হইতে পয়সা পাওয়ার আশা করে নাই বিমলা। চেষ্টাও করে নাই। দুপুর বেলায় খুব ক্ষুধা পাইয়াছিল তাহার। বার দুই জল খাইতেই ক্ষুধার জ্বালা নিবিয়া গিয়াছে। তা'ছাড়া হিন্দুঘরের বিধবা সে। উপবাস করা অভ্যাস আছে। সারা দুপুর ঠাণ্ডা মেজেতেই শুইয়া, চোখ বুজিয়া, নিজের কথাই ভাবিয়াছে সে। মাঝে মাঝে মাতঙ্গিনী আসিয়া তার চিন্তার সূত্রকে ছিঁড়িয়া দিয়াছে। কখনও গালাগালি করিয়াছে। কখনও অনুনয়-বিনয় করিয়াছে। দুপুর বেলায় অঘোর যখন ক্ষুধার জ্বালায় ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে শুরু করিল, তখন মাতঙ্গিনী আসিয়া তাহার পায়ের কাছে মাথা ঠুকিয়াছে। কিন্তু মাতঙ্গিনী চলিয়া যাওয়া মাত্র সে আবার ছিন্ন সূত্র জুড়িয়া লইয়াছে।

বিমলার মা যখন মারা যান তখন তাহার বয়স দুই বৎসর মাত্র। মায়ের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাহার বাবা সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া

গেলেন। সে কাকার সংসারে মানুষ হইতে লাগিল। বাবা আর সংসারে ফিরিলেন না। কোন খোঁজ-খবরও পাওয়া গেল না তাঁহার। বিমলার বয়স দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কাকীমা তাহার বিবাহের জন্য কাকাকে তাগিদ দিতে শুরু করিলেন। কিন্তু কাকা কি করিবেন? অবস্থা তাঁহার ভাল ছিল না। তা'ছাড়া নিজেরও চারটি মেয়ে। কাজেই দু'বেলা কাকীমার ধমক নীরবে সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। হঠাৎ সুরাহা হইল। তাহাদের গ্রামের স্কুলে একজন নূতন মাষ্টার আসিল। নাম—হরিসাধন বাবু। বি. এ. পাশ। অবিবাহিত। তাহাদের স্বজাতি। কাকার সহিত তাহার কেমন করিয়া আলাপ হইল। কাকা একদিন তাহাকে তাহাদের বাড়িতে ডাকিয়া আনিলেন। চা দেওয়ার অছিলায় তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। হরিসাধনের খুব পছন্দ হইল তাহাকে। বিবাহ করিতে রাজি হইল। পাছে দেরী হইলে এ সুযোগ হাত-ছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে কাকা, হরিসাধনের মামা-মামীকে খবর না দিয়াই, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বিবাহ সারিয়া ফেলিলেন।

বিবাহের পর যেদিন বিমলা স্বামীর সহিত শ্বশুরবাড়ীতে পা দিল, মামা-শ্বশুর অঘোর মাথায় হাত চাপড়াইতে লাগিল, মামী-শাশুড়ী মাতঙ্গিনী তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিল। কোন এক যায়গায় মোটা পণে হরিসাধনের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল তাহারা। সেটা হাত-ছাড়া হইয়া গেল—এই ক্ষোভে তাহারা দুইজনে যেন পাগল হইয়া উঠিল। কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করিলে পাছে হরিসাধনও হাত-ছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে দিনকয়েক পরেই ঠাণ্ডা হইল। কিন্তু বিমলার প্রতি তাহাদের মন কিছুতেই প্রসন্ন হইল না।

তাহাদের গ্রামে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া হরিসাধন তাহাকে লইয়া সংসার পাতিল। অল্প আয়। মামাকেও কিছু টাকা প্রতি মাসে পাঠাইতে হইত। তবু, কয়েক বৎসর সুখে কাটিল। সুখের মধ্যে একটি মাত্র কাঁটা ছিল—তাহাদের ছেলে-মেয়ে হয় নাই। মাঝে মাঝে এই কাঁটাটাই তাহাদের দুইজনের মনের গায়ে ফুটিয়া বেদনা দিত। কিন্তু পরস্পরের স্নেহ ও সহানুভূতিতে সে বেদনা মুহূর্তে মিলাইয়া যাইত।

হঠাৎ একদিন সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। স্বামী পরীক্ষার্থী ছেলেদের লইয়া শহরে গেল। সেখানে জ্বর হইল। যখন তাহাকে বাড়িতে আনা হইল, তখন

তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। তিন দিন মাত্র স্বামীকে সেবা করিতে পাইয়াছিল বিমলা। শেষ দিন একটুখানি জ্ঞান হইয়াছিল। দুটি ঘোলাটে চক্ষু মেলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল; চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল; কোন কথা বলিতে পারে নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিমলা কাকার বাড়িতে ফিরিয়া গেল। মাগ্যি-গণ্ডার বাজার। কাকার স্বল্প আয়। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া মস্ত বড় সংসার। সংসার চালানোই কাকার দায় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপরে আর একটি নিঃসহায়া বাল-বিধবার ভার ঘাড়ে পড়িল। কাকা ও কাকী মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু চিন্তার মোহে তাঁহাদের মুখ কালো হইয়া উঠিল। সেখানে থাকা বিমলা যুক্তি-যুক্ত মনে করিল না। একদিন জোর করিয়া এখানে চলিয়া আসিল।

তাহাকে দেখিয়া, অঘোর ও মাতঙ্গিনী কান্নাকাটী করিল, তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য তাহাকে গালাগালি করিল। কিন্তু প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দুই শত টাকা হাতে পাইতেই শান্ত হইল। সেই টাকাতে বকেয়া বাজার কিছু শোধ হইল। সংসার খরচ চলিতে লাগিল। তারপর দুর্ভিক্ষের করাল মেঘ ঘনাইয়া আসিল। চালের দাম দশগুণ বাড়িয়া গেল। বিমলা তাহার সামান্য অলঙ্কার যাহা ছিল, একে একে বাহির করিয়া দিল। তাহাই বাবুদের বাড়িতে বন্ধক দিয়া কয়েক মাস সংসার চলিল। শেষে যখন আর কোন উপায় রহিল না, অঘোর ও মাতঙ্গিনীর পীড়াপীড়িতে বিমলা বাবুদের বাড়িতে চাকুরি লইতে বাধ্য হইল।

বৈধব্য জীবনের দুঃখ এই সময় হইতে শুরু হইল। বাবুদের প্রকাণ্ড সংসার। সকাল আটটায় রান্নাঘরে ঢুকিতে হইত। সকালের খাওয়া-দাওয়া চুকিতে বেলা তিনটা বাজিয়া যাইত। তারপর, থালায় করিয়া তিনজনের ভাত-তরকারী লইয়া বিমলাকে বাড়িতে ফিরিতে হইত। এই সময়টায় তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না। সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিয়া, মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া, সে রাস্তা দিয়া আসিত। তবু পাড়ার কোন মেয়ে, রাস্তায় তাহাকে দেখিলেই, থামাইয়া প্রশ্ন করিত—ভাত নিয়ে আসছ বুঝি? গলা বাড়াইয়া, থালাটার উপরে দৃষ্টি বুলাইয়া কহিত—ডাল-তরকারীও দেয় দেখছি! তা' তোমাদের এক রকম করে চলে যাচ্ছে, বাপু, ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই বুড়ো-বুড়ী বেঁচে গেল—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিত—ভগবান আছেন! কি যে হবে আমাদের। এ

পাড়ায় সকলের অবস্থাই অত্যন্ত কাহিল। সকলের সম্পত্তিই বাবুরা গ্রাস করিয়াছে। তার উপর, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। পুরুষগুলি সারা বৎসর জ্বরে ভুগে। বাহিরে গিয়া দু'পয়সা রোজগার করিয়া আনিবার ক্ষমতা নাই কাহারও। কাজেই দাসীবৃত্তি করিয়াও দুই মুঠা অন্ন সংস্থানকেও সকলে সৌভাগ্য বলিয়া হিংসা করে।

আবার সন্ধ্যায় বাবুদের বাড়ি যাইতে হইত বিমলাকে। কাজ চুকাইয়া ফিরিতে রাত্রি বারটা বাজিয়া যাইত। বাবুদের স্বজাতি হইলেও, সে একজন দরিদ্র প্রজার বৌ। কাজেই, বাবুদের বাড়ির কেহ তাহাকে সম্মান করিত না। আর পাঁচজন ঝি-চাকরানীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিত, তাহার চেয়ে ভাল ব্যবহার করিত না। তবে, নেহাৎ ব্রাহ্মণের বাড়ির বিধবা এবং বয়স কম বলিয়া বাবুর মা রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময়ে একজন চাকরকে সঙ্গে দিতেন। কোন কোন দিন ক্ষীরোদা বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া যাইত।

একমাস বেশ কাটিল। তাহার ছেঁড়া কাপড় দেখিয়া বাবুর মা তাঁহার একখানি পুরাতন কাপড় তাহাকে পরিতে দিলেন। লইতে মাথা কাটা গেল। কিন্তু নিরুপায়ে লইতে হইল।

ক্ষীরোদা প্রথম দিন হইতেই তাহার অভিভাবিকা হইয়া উঠিল। সময়ে অসময়ে, কাজকর্ম্ম-চালচলন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বাবুদের বাড়ির উপযুক্ত পাচিকা হইবার জন্য তাহাকে তালিম দিতে লাগিল এবং আড়ালে-আবডালে বাবুর রূপ-গুণের প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বিমলা প্রতিবাদ করিত না, নীরবে শুনিয়া যাইত। একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময়ে ক্ষীরোদা তাহার আঁচল হইতে একটি নূতন ধুতি বাহির করিয়া কহিল—বাবু তোমার জন্যে কিনে দিয়েছেন। কথা বলার ধরণে গা ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল বিমলার। কহিল—মামী-শাশুড়ীর হাতে দিও।

ক্ষীরোদা কহিল—পাগল নাকি! ও বুড়ী কি তোমাকে দেবে ভাবছ?

—নরুন-পাড় ধুতি নিয়ে উনি কি করবেন?

—বুড়োকে পরাবে, না হয়, বেচে দেবে—

—বাবুর নাম করে বলে দিও—

ক্ষীরোদা বলিল—তুমিই নাও না, বাপু, হাত পেতে। এত করে কিনে

এনেছেন তোমার জন্যে। এমন লোক হয় না পৃথিবীতে। গরীবের উপর বড় দয়া। বলছিলেন, ভারী দুখিনী মেয়েটা। ধুতি কি ওকে মানায়? কালো কস্তা পেড়ে শাড়ী পরলেই ওকে মানায়। কিন্তু উপায় কি বল্—

বাড়ির কাছে আসিতেই ধুতিটা হাতে গুঁজিয়া দিয়া গেল ক্ষীরোদা।

পরের দিন হইতে রান্নাঘরের দিকে বাবুর আনাগোনা বাড়িল। কাজে ঢোকার পর হইতে রান্নাঘরে ঝিএর কাজ পর্য্যন্ত তাহাকে করিতে হইত। বাবু জানিতে পারিয়া বলিলেন—সব কাজ ওর ঘাড়ে চাপালে চলবে কেন? ঝি-রা কি করে? রান্নাঘরের জন্য একজন ঝি বহাল হইল। রাত্রে তাহার জন্য রুটীর ব্যবস্থা হইল। ঝি-চাকর মহলে আলোচনা শুরু হইল! মামী শাশুড়ীর কানেও কথাটা পৌছিল। অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, আনন্দিত হইয়া উঠিল সে। মাঝে মাঝে তাহাকে তাগিদ দিতে লাগিল—কাপড়-চোপড়গুলো একটু পরিষ্কার কোরো, বৌ! ছিমছাম থেকো। বড়লোকের বাড়ি চাকরি। আর দেখ, মাথাটা এমন কাকের বাসা করে রাখ কেন বল দেখি! তেল দিও। নারকেল তেল নাই? এনে দেব কাল চার পয়সার। বিনাইয়া বিনাইয়া বলিল—কপালের লিখন ছিল বৌ! স্বামী হারিয়েছ। তা' বলে তো সন্ন্যাসিনী হ'লে চলবে না! ক্ষীরোদার অন্তরঙ্গতা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সব সময় কাছে কাছে থাকিত। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাবুর কথা বলিত। বাল-বিধবাদের উপর বাবুর কত দরদ! তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কত আগ্রহ! বিশেষ করিয়া বিমলার উপর তার কত টান! রাত্রে ক্ষীরোদাই দিন তাহাকে বাড়ি পৌছাইয়া দিতে লাগিল। এমনই রাস্তা ধরিয়া অনেকখানা ঘুরিয়া আসিতে হইত বলিয়া বৈঠকখানার সামনে দিয়া সোজা রাস্তায় আসিত। ভূপতি বৈঠকখানায় বসিয়া থাকিত। তাহাদিগকে দেখিলেই, ক্ষীরোদার উদ্দেশে বলিত—চললি নাকি? বৌএর খাওয়া হয়েছে তো? একদিন ক্ষীরোদা ঘাটের সামনে আসিয়া বলিল—তুমি একটু দাঁড়াও বৌ! আমি ঘাট থেকে আসি বলিয়া চলিয়া যাইতেই, ভূপতি কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল—এত লজ্জা কিসের? সাধন আমার বন্ধু ছিল! আমার কাছে এত ঘোমটা না দিলেও চলবে। বিমলা বাড়ি আসিয়াই মামী শাশুড়ীকে ব্যাপারটার পরিচয় দিতেই, সে কহিল—বন্ধুই তো ছিল। এক মন, এক প্রাণ। ওকে এত লজ্জা করতে হবে না তোমাকে। পরের দিন রাত্রে

ভূপতি ক্ষীরোদার সামনেই তাহাকে ডাকিল বৌ, শোন। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া, ঘামিতে লাগিল। ক্ষীরোদা কহিল—যাও না, গো! বাবু কি বলছেন, শোন গে। ভূপতি আগাইয়া কহিল—ঘোমটা খোল দেখি। তোমার সঙ্গে কথা আছে। সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপতি কহিল—মুখখানি দেখে যদি একটু সুখ পাই, তাতেও নারাজ? ভারী নিষ্ঠুর তো তুমি? বলিয়া নিজের রসিকতায় হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল ভূপতি। সে পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিল। সেদিনও বাড়িতে আসিয়া মাতঙ্গিনীকে সব বলিল বিমলা। মাতঙ্গিনী কহিল—ভূপতি গাঁয়ের জমিদার। ওর যদি নজর পড়েছে তোমার উপর, তো, গুছিয়ে নাও। জমি-যায়গা, ঘরবাড়ি ও গয়না-গাঁটি সব উদ্ধার করে নাও। আমরা আর ক'দিন! তোমারই সব। এখনও অনেকদিন বাঁচতে হবে বাছা! তোমাকে। এ বয়স বেশী দিন থাকবে না। ক্ষীরোদা নাপিতের মেয়ে হয়েও ও বাড়িতে গিন্নীর মতন হয়ে আছে। বুঝে-শুঝে চললে তুমিও তাই হবে। মাতঙ্গিনীর মনের এই গোপন, ঘৃণ্য অভিপ্রায়ের সুস্পষ্ট আভাসে বিমলার সমস্ত অন্তর অসহায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং যে-মেয়ে মানুষ, সামান্য স্বার্থ ও সুবিধার লোভে কন্যাস্থানীয়া পুত্রবধূকে নর-পিশাচের লালসাগ্নিতে আত্মাহুতি দিবার জন্য প্ররোচনা দিতে পারে, তাহার উপরে তাহার অশ্রদ্ধার সীমা রহিল না।

কিন্তু একজন তাহাকে ভাইএর মত সান্ত্বনা ও বন্ধুর মত সাহস দিতে লাগিল। সে ফটিক। ফটিক তাহার স্বামীর অতি প্রিয়পাত্র ছিল। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পরে তাহার বাবার মৃত্যু হয়। কাজেই সে আর পড়াশুনা করিতে পারে নাই। বাড়িতে চাষ-বাস ছিল; তাহাই দেখাশুনা করিত। গ্রাম হইতে কিছুদূরে বাবুগঞ্জে কয়েকজন ছেলের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব ছিল। ছেলেগুলি কম্যুনিষ্ট। তাহাদের সঙ্গে শহরে গিয়া সেখানের কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল। সেখান হইতে নানারকমের বই আনিয়া বাড়িতে পড়িত। গ্রামের ছোটলোকদের লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিত। তাহাদিগকে মুক্তির বাণী শুনাইত; তাহারাই যে সমাজের বাহক ও পালক, বুঝাইবার চেষ্টা করিত। মুমূর্ষু ব্যক্তির কানের কাছে রাম-নাম উচ্চারণের মত তাহা বৃথা হইলেও, তাহাদের ভাবী মুক্তিলাভ সম্বন্ধে সে নিজে মনে মনে নিঃসংশয় বিশ্বাস পোষণ করিত। বিমলাকেও সে

নানারকমের বই পড়িতে দিত। বিমলা তাহার সামান্য বিদ্যা লইয়া যতটুকু বুঝিত, তাহাতে আনন্দ পাইত, তৃপ্তি পাইত, আশা ও আশ্বাস পাইত। তাহার দুর্ভাগ্যের আকাশ-জোড়া ঘন কালো মেঘের মধ্যে মুক্তির দীপ্ত-মধুর আলো ফুটিয়া উঠিত। ব্যর্থতাই জীবনের শেষ পরিণাম নয়; ভাবী জীবনের মধ্যে অপেক্ষা করিতেছে পরিপূর্ণ চরিতার্থতা; দৃঢ়-পদে, সুস্থ-সবল হৃদয়ে, শুচি-শুদ্ধ দেহে-মনে, বন্ধুর, কঙ্করময় পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই, তাহা আয়ত্ত করা যাইবে—এই বিশ্বাস তাহার মনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইত।

দিনকয়েক এই ভাবেই কাটিল। অজগরের মত ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি মেলিয়া ভূপতি তাহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া রহিল; মাতঙ্গিনী ও ক্ষীরোদা তাহাকে ক্রমাগত সেই মুখগহ্বরের দিকে ঠেলিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তের এই দুঃসহ গ্লানি ও অপমান হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তর ছটফট করিতে লাগিল। একদিন সে ফটিককে বলিল—ভাই, আর থাকতে পারছি না এখানে। নিয়ে চল না কোথাও?

ফটিক বলিল—কোথায় যাবেন বৌদিদি!

—তোমাদের শহরে। যেখানে তুমি প্রায়ই যাও।

—আপনার শ্বশুর-শাশুড়ীর কি হবে?

শ্বশুর-শাশুড়ীর নাম শুনিয়া বিমলার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল—যা' হবার হবে। আমি আর পারছি না।

ফটিক বলিল—তা' কি হয় বৌদিদি! আপনি আছেন বলে ওঁদের কোন রকমে চলে যাচ্ছে। না হলে, না খেয়ে মরে যেত এতদিন।

বিমলা নীরবে অনেকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর কহিল—আচ্ছা, ঠাকুর পো, মেয়েরা তো আজকাল চাকরি-বাকরি করে। কত বড় পাশ করলে চাকরি পাওয়া যায়?

ফটিক কহিল—বি. এ, এম. এ.

বিমলা অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া কহিল—অত বড় না। ধর তোমার মত যদি পাশ করা যায়, তা'হলে?

—তা'হলে ছোট স্কুলে চাকুরি হতে পারে।

—তোমার তো এত বন্ধু-বান্ধব আছে, সহরে যাঁদের কাছে যাও, ওঁরা আমার মত অনাথা মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না ?

—কি জানি, বৌদি ! এবার গেলে জিজ্ঞাসা করব।

ভূপতি যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল, ততই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল বিমলা। ফটিকের সঙ্গে দেখা হইলেই তাগিত দিত ঠাকুরপো বলেছিলে ওঁদের ?

ফটিক জবাব দিত—বলেছিলাম বৌদিদি ! ব্যবস্থা এখনও করতে পারেন নি। চেষ্টায় আছেন।

একদিন, এই ধরণের জবাবের পরেই, বিমলা হতাশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আবার কবে চেষ্টা করবেন ? আমার যে আর দেরী সইছে না ভাই।

ফটিক বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কেন বলুন দেখি— ?

বিমলা বলিল—সব কথা শুনে কাজ নাই, ভাই ! মোটকথা, আমাকে যদি কোনমতে সৎভাবে, সহজভাবে, বাঁচবার ব্যবস্থা ক'রে না দাও, তো আমাকে আর বেশীদিন দেখতে পাবে না—

বিমলার মুখের শঙ্কিত ভাবে ও আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে ফটিক কিছু আন্দাজ করিল কি না সেই জানে ; কহিল—আমাদের এক দিদি আছেন। শরীর খারাপ বলে তাঁর দাদার কাছে গেছেন। শীগ্‌গির আসবেন। তাঁকে বলে দেখব, তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

বিমলা বলিল—কি করেন তিনি ?

—স্কুলে মাষ্টারী। খুব ভাল তিনি। সকলকে এত স্নেহ করেন ! আপনার কথা তো তাঁকে কোনদিন বলিনি। বলে দেখব একবার, যদি নিজের কাছে আপনাকে রাখেন।

আগ্রহভরে বিমলা কহিল—বোলো, বোলো ভাই ঠাকুরপো !

সেইদিন হইতে বিমলার মনে একটি আশার ক্ষীণসুর অনুক্ষণ বাজিতে লাগিল। রাত্রে চোখ বুজিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবী জীবনের কথা ভাবিত। দিদির কাছে সে যাইবেই। তিনি তাহাকে আশ্রয় দিবেন, লেখাপড়া শিখাইবেন, তারপর কোন একটা স্কুলে চাকরি করিয়া দিবেন। এই ঘৃণ্য দাসীবৃত্তি, অসচ্চরিত্র, অত্যাচারী পুরুষের হাতে এই প্রতিনিয়ত অপমান, নগ্ন স্বার্থপরতার পঙ্কিল প্রতিবেশে এই প্রতিমুহূর্ত্তের গ্লানি,—সমস্ত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইবে—ইহা যতই সে চিন্তা

করিত ততই সে মনে সাহস পাইত; ততই এই আশ্বাস তাহার অন্তর মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া উঠিত যে—মানুষ নিঃসহায়, একাকী নয়; ভূপতির জমিদারীর সীমানা পৃথিবীর সীমারেখা নয়; এই সীমানার বাহিরে আছে সত্যকার মানুষ, আছে সুন্দর পৃথিবী, সার্থক জীবন; আছে বন্ধুর প্রীতি ও আত্মীয়ের আত্মীয়তা।

এই ক্রমবর্দ্ধমান সাহসের জন্য সে একদিন ভূপতিকে অপমান করিয়া বসিল।

সেদিন রাত্রিতে বৈঠকখানার সামনে আসিতেই আলোটা নিবিয়া গেল। ক্ষীরোদা বলিয়া উঠিল—এই যাঃ, আলোটা নিবে গেল। তুমি একটু দাঁড়াও, বৌ! আলোটা জ্বেলে নিয়ে আসি।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল বিমলা। হঠাৎ দেখিল, কে একজন আসিতেছে। বিমলা বুঝিল—কে সে। সভয়ে ডাক দিল—ক্ষীরোদা! ক্ষীরোদার সাড়া নাই।

ভূপতি কাছে আসিয়া কহিল—ভয় পেয়েছ নাকি? ভূত নয়; আমি—ভূপতি। ভূ—মানে জান বিমলা? পৃথিবী। পৃথিবীর পতি আমি, তোমারও।

বিমলা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি। আপনার বাড়িতে চাকরি করছি বলে, যা'তা' বলবার অধিকার নাই আপনার।

ভূপতি বলিল—চাকরি করতে তোমাকে কে বলেছে? তুমি যদি রাজী হও তো, তোমারই চাকরি করবে কত লোক।

তীব্রস্বরে বিমলা কহিল—আবার ওরকম কথা বলছেন?

ভূপতি আরও কাছে সরিয়া আসিল। বিমলার এক হাতে ভাতের থালা। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল তাহার। ভাতের থালাটা পড়িয়া যায় বুঝি। বুড়াবুড়ী তাহা হইলে তাহাকেই খাইয়া ফেলিবে আজ!

ভূপতি একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার উত্তেজিত, উত্তপ্ত নিশ্বাস বিমলার মুখ ঝলসাইয়া দিতে লাগিল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—দেখুন চেঁচিয়ে দেব এখনই—

হাসিয়া ভূপতি কহিল—চেঁচাও না, যত পার। কে আসবে এখানে? কার অত বড় ক্ষমতা? ঠিক এমনই সময়ে এখান থেকে অনেক মেয়ের চীৎকার শুনেছে গাঁয়ের লোক। কেও কোন দিন আসেনি সাহায্য করতে, আজও আসবে না।

বিমলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—আপনি মানুষ? না পশু? পশুরও অধম আপনি। আমার কাছ থেকে সরে যান। গা ঘিন ঘিন করছে আমার।

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া ভূপতি কহিল—তাই নাকি? আচ্ছা আজ ছেড়ে দিচ্ছি। নিজে থেকে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়তে হবে তোমাকে। না হ'লে আমার নাম ভূপতি বাঁড়ুজ্জে নয়—বলিয়া চলিয়া গেল।

তার পর দিন হইতেই কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে বিমলা।

৩

মাতঙ্গিনী চীৎকার করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল, বলিতে লাগিল, এমন লোকের নামে কুচ্ছো, জিব তার খ'সে যাবে! কি করলি আমাদের? চাল দিয়েছে, দুটো কাঁচকলা দিয়েছে, সেদ্ধ ক'রে খাব দুজনে। অঘোরকে হাঁকিয়া কহিল, শুনছ! যাবামাত্র চাল দিলে দুজনের, বললে, তোমাদের কি দোষ? তোমাদের কি চিনি না আমি, কেমন লোক তোমরা! নিয়ে যেও চাল রোজ এসে, তবে ঐ মাগীটাকে জব্দ করা দরকার, ভারি তিড়বিড়েনি হয়েছে ওর, গুণে একটি ভাত পর্য্যন্ত দিও না ওকে; ফ্যান বরং রাস্তার কুকুরকে ডেকে দেবে, ওকে দিও না। দম লইয়া কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ নামাইয়া কহিল, সত্যি! এমন একটা লোক। মহাদেবের মত চেহারা, তেমনই মন। তার সঙ্গে এমন ব্যাভার! ছিঃ ছিঃ! জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া!

অঘোর বিরক্তির স্বরে কহিল, আর চেঁচাতে হবে না, যা ভাতে ভাত সিদ্ধ কর্‌গে যা, ক্ষিদেয় আঁত থাক হয়ে গেল আমার।

মাতঙ্গিনী হাত নাড়িয়া কহিল, আমার ওপরেই যত তেজ! গেলবার ব্যবস্থা ক'রে আন্‌ছি যে! ওই হারামজাদা নেমকহারাম মাগীকে জব্দ করতে পার না? অঘোর কহিল, হবে, হবে, সব ব্যবস্থা হবে, তুই এখন যা তো।

মাতঙ্গিনীর রান্না শেষ হইতে বেলা গড়াইয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে খাইতে বসিয়াছিল, ক্ষীরোদা আসিয়া দাঁড়াইল, কি গো বামুন-খুড়ী, কি হচ্ছে তোমাদের? তোমাদের বউকে দেখছি নে? মাতঙ্গিনী বুঝিল, ভূপতি চর পাঠাইয়াছে, বউকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য। আপ্যায়নসহকারে কহিল, আয় মা ক্ষীরোদা! ব'স্, বউয়ের কথা বলিস নে মা! সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আর বেরোয় নি। দুজনের চাল দিয়েছে ভূপতি, বার বার ক'রে মানা ক'রে দিয়েছে, বউকে যেন এক মুঠোও দেওয়া না হয়। আমি কথা দিয়ে এসেছি, ভাঙবার লোক

কি ? দেখ্ না মা, হাঁড়ি খালি ক'রে তুজনের পাতায় ঢেলেছি। ক্ষীরোদা এক পা আগাইয়া আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাঁড়ির দিকে তাকাইতেই মাতঙ্গিনী কহিল, একমুঠো ফেন-ভাত রেখেছি বুড়োর জন্যে, রাত্রে যদি খেতে চায়, আর বউ তো ভাত খায় না রাত্রে, বিধবা মানুষ।

দেখি, তোমার বউ কি করছে !—বলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষীরোদা বিমলার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কহিল, কি গো বউ, কি করছ ? বিমলা মুখ ঘুরাইয়া লইল। ক্ষীরোদা কহিল, মুখের দিকেও তাকাবে না কি গো ! এত পাপিষ্ঠা আমি ? মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বিমলা কহিল, তুমি পাপিষ্ঠাই বটে।

ক্ষীরোদা খনখন করিয়া কহিল, বেশ, তাই। তুমি নিজে ত ভাল। দেখা যাবে, অনেক দেখলাম এই বয়সে, আমার সঙ্গেই একদিন মিতেন পাতাবে তুমি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিমলা রান্নাঘর হইতে কলসী লইয়া বাহির হইতেই মাতঙ্গিনী কহিল, এই ভরাসন্ধ্যেয় কোথা যাচ্ছ ?

বিমলা কহিল, এক কলসী জল নিয়ে আসি।

মাতঙ্গিনী কহিল, সারা দিন গেল আলে-থালে রাতের পিছে বাতি জ্বালে, বিকেলবেলায় পা মেলে ব'সে না থেকে আনলেই পারতে। বিমলা জবাব না দিয়া বাহিরের দিকে চলিল। মাতঙ্গিনী কহিল, যাচ্ছ, যাও, ফটকে ছোঁড়ার সঙ্গে দেখা হ'লে কথাবার্ত্তা ব'লো না, ভূপতি এমনি রেগে আছে, কোন কথা কানে গেলে বাকি রাখবে না।

বিমলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই বা না কই, তাতে তার কি ? সে কি আমার—। মাতঙ্গিনী কহিল, সে চোদ্দ পুরুষ। গাঁয়ের রাজা, রাজা। এমনই যদি তোমাকে মাথা ন্যাড়া ক'রে ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে, গাঁ থেকে বার ক'রে দেয় তো গাঁয়ের কারও সাধ্য নেই আটকায়। বিমলা চলিয়া গেল।

গ্রামের পাশেই একটি নদী, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এত ছোট যে, ইহাকে নদী বলা চলে না, এ অঞ্চলে কেহ বলেও না ; বলে, যোড় ; নাম ডাকিনীর যোড়। গ্রামের বাহিরে দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিকে তাকাইলে দিগ্বলয়ের সমান্তরালে যে ছোট-খাটো পাহাড়ের সারি দেখা যায়, উহাদের একটাতে ইহার উৎপত্তি, মাইল দশ মাত্র

ইহার গতিপথ ; এ গ্রাম হইতে মাইল কয়েক দূরে বিড়াই নদীর বুকে ইহার আয়ুরেখার সমাপ্তি। সারা বৎসরের মধ্যে কখনও ইহার বুকে একটানা স্রোত বহে না, প্রচুর বর্ষণের পরে পাহাড়ের ঢল নামিয়া গেরুয়া রঙের জলস্রোত দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিতে থাকে, ঘণ্টা কয়েকের পরে আবার যে-কে সেই, অভ্রকণা-খচিত শ্বেত বালুবক্ষ। গ্রামের লোক কিন্তু সারা বৎসর ইহারই জল পান করে। ইহার শুষ্ক বালুবক্ষের নীচে একটি শীর্ণ জলধারা আছে, বক্ষ বিদীর্ণ করিলেই ক্ষত স্থান কাচের মত স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

বিমলা নদীর দিকে চলিল। ফটিকের বাড়ির কাছ দিয়া পথ। পথের ধারে একটা ডোবায় কতকগুলা বাউরীদের ছোট-ছোট ছেলে ছিপ দিয়া ব্যাঙ ধরিতে-ছিল, ফটিক ডোবার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। বিমলাকে দেখিতে পাইয়াই ফটিক কি বলিবার চেষ্টা করিতেই বিমলা চোখের ঈঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। ঠিক সামনেই জনকয়েক এই পাড়ার মেয়ে নদী হইতে জল লইয়া ফিরিতেছিল। ফটিক মুখ ফিরাইয়া আবার ছেলেদের সঙ্গে গল্প শুরু করিল। মেয়েদের কে মন্তব্য করিল, ন্যাকাপড়া শিখে আলাপ করবার লোক জুটিয়েছে ভাল! আর একজন কহিল, মাথার ওপর বাপ নেই, মা তো ওই হাবা-গোবা মানুষ, রীত তো ওই রকমই হবে।

পাড়া পার হইলেই মাঠ। আল-পথ দিয়ে কতকটা গেলেই নদী। অনেক মেয়ে জল লইয়া ফিরিতেছিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এত সন্ধ্যে ক'রে এলে? কেহ জিজ্ঞাসা করিল, অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন গো? জ্বর-টর হয়েছে নাকি? একজন জিজ্ঞাসা করিল, শাশুড়ী এত চেঁচাচ্ছিল কেন সকালে? ঝগড়া-ঝাঁটি হচ্ছিল বুঝি? কখনও মৃদু হাসিয়া, কখনও ঘাড় নাড়িয়া, কখনও চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলা তাহাদের পার হইয়া গেল।

ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পশ্চিম-আকাশে অস্তরাগের শেষ আভাটুকু মিলাইয়া গিয়াছে। ফিকা তরল অন্ধকার সারা মাঠের বুকে জমিয়া উঠিতেছে। আকাশে তারা ফুটিতে শুরু করিয়াছে। জলপূর্ণ ভারী কলস কক্ষে লইয়া বিমলা ধীরে ধীরে পা টানিয়া টানিয়া আল-পথে চলিতেছিল ; মাঝপথে ফটিকের সঙ্গে দেখা হইল। ফটিক তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল ; বিমলার সঙ্গ লইয়া কহিল, এত দেরি করলেন? বিমলা জবাব না দিয়া কহিল, তুমি শহর

থেকে ফিরলে কখন? ফটিক কহিল, কাল সন্ধ্যেয়। আজ সকালে তো—। বিমলা বাধা দিয়া কহিল, আমার কোন ব্যবস্থা হ'ল? এসেছেন তোমাদের সেই দিদি? ফটিক কহিল, তিনি এখনও আসেন নি বউদি; শরীর নাকি তাঁর আরও খারাপ হয়েছে; দু-চার মাস আসতে পারবেন না বোধ হয়। তবে আমি ব'লে এসেছি ওখানের কর্ম্মীদের; তাঁরা বলেছেন, হাতে এখন তেমন কোন ব্যবস্থা নেই; তবে তাঁরা চেষ্টা করবেন। বিমলা থামিয়া দাঁড়াইয়া ফটিকের দিকে তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, তোমাদের কর্ম্মীদের আমি চিনেছি ভাই। ওঁরা মুখে বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু সত্যিকার কোন কাজ করবার ক্ষমতা ওঁদের নেই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, পৃথিবীতে সবাই তেলা মাথায় তেল দিতেই ব্যস্ত; যাদের সত্যিকার সাহায্য দরকার, তাদের জন্যে কেউ কিছু করে না; যাক গে, যা আছে অদৃষ্টে হবে।—বলিয়া আবার চলিতে শুরু করিল।

জনশূন্য মাঠ, চারিদিকে অন্ধকারের আবেষ্টনী। অনপচয়িতযৌবনা, সুন্দরী নারীর রক্তাভ মুখ ও রোষদীপ্ত চোখের দিকে তাকাইয়া ফটিকের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরের কম্পন যথাসম্ভব স্তিমিত করিয়া কহিল, আরও দিনকতক অপেক্ষা করুন বউদিদি, ওঁরা যখন চেষ্টা করবেন বলেছেন, তখন নিশ্চয় একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। বিমলা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, আর কদিন অপেক্ষা করব। একটা মানুষ কদিন উপোস ক'রে থাকতে পারে? ফটিক বিস্ময়ের স্বরে কহিল, উপোস ক'রে আছেন নাকি? বিমলা শুষ্কস্বরে কহিল, হঁ্যা, কাল সারা দিন-রাত প্রায় উপোস গেছে, আজও সারাদিন চলেছে। ফটিক কহিল, কেন? বিমলা কহিল, কি ক'রে যে আমাদের পেট চলে জান তো! বাবুদের বাড়ির কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। ফটিক থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, সে কি! বিমলাও থামিয়া কহিল, হঁ্যা, খাটতে আমার আপত্তি নেই, কসুরও করি নি; কিন্তু অপমান—। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অপমান সহ্য করব কি ক'রে? ফটিক বুঝিল, তবু প্রশ্ন করিল, কে অপমান করলে আপনাকে? বিমলা কহিল, ভূপতি রায়। দিনের পর দিন অপমানের মাত্রা বেড়েই চলেছে; ছোটলোকদের মেয়েদের নষ্ট ক'রে ক'রে ওর বুকের পাটা বেড়ে গেছে; আমাকেও নষ্ট করতে চায় ও। ঠাকুরপো, দেহের কষ্ট সহ্য করা যায়, কিন্তু দেহ নষ্ট করার গ্লানি সহ্য করব কি ক'রে? দম

লইয়া কহিল, তাই ছেড়ে দিলাম। উপোস দিয়ে বরং মরব, তবু ও-ভাবে মরা— মাথা নাড়িয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, পারব না।

ফটিকের বাড়ি পার হইয়া আসিয়াছিল তাহারা। রাস্তাটা এখানে মোড় ঘুরিয়া বিমলাদের বাড়ির সামনে দিয়া গিয়াছে। বিমলা কহিল, আচ্ছা, আসি ভাই।

ক্ষীরোদা বিমলাদের বাড়ির দিক হইতে আসিতেছিল। কাছে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কে গা? বামুন-বউ বুঝি? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছ গা? আরও কাছে আসিয়া কহিল, ওঃ ফটিক! আমি ভাবি কে! ওকে সঙ্গে ক'রেই জল আনতে গিছলে নাকি? না, এখানেই পাকড়াও করলে? দুই ওষ্ঠ সহযোগে শ্লেষ-ব্যঞ্জক শব্দ করিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, কত রঙ্গই শিখেছ বউ! আমরাই শুধু আকাট র'য়ে গেলাম।—বলিযা চলিয়া গেল। বিমলা দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, বজ্জাত মাগী! বেশ্যা। ফটিক কহিল, ওর কোন দোষ নাই বউদি, যা করেছে বেঁচে থাকবার জন্যেই করেছে। দুই চোখ বড় করিয়া বিমলা কহিল, ওই রকম ক'রে বেঁচে থাকা! গভীর ঘৃণার সহিত কহিল, ছিঃ! ফটিক কহিল, যেমন ক'রে হোক বেঁচে থাকাই আসল কাজ—বেঁচে থাকা আর বাঁচিয়ে রাখা। ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে শক্তির সঞ্চয়, কুশলী হাতের কৌশলে এই শক্তি যখন সংহত হয়, সক্রিয় হয়, তখন দেশের চেহারা বদলে যায়। ওদের দেশে তাই জনশক্তির এত মর্য্যাদা, প্রত্যেকটি জনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাই প্রাণপণ চেষ্টা।

বিমলা শ্লেষের স্বরে কহিল, তাই প্রত্যেক দিন হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে! ফটিক কহিল, দেব-দানবে যুদ্ধ তো সব যুগেই আছে বউদিদি। দানবীয় শক্তির ধ্বংস ক'রে দৈব শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এই লোক-ক্ষয়। কিন্তু এর একদিন শেষ হবে, অকল্যাণের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে কল্যাণের স্বর্ণ-দেউল। নবযুগের আবির্ভাব হবে সারা পৃথিবীতে, আমাদের দেশেও। সে যুগে প্রতেকটি মানুষ সার্থক হবে, ধন্য হবে। যার যতটুকু শক্তি আছে কাজে লাগাবে, কিছু ফেলা যাবে না। ওই ক্ষীরোদাই দেখবেন কত কাজের মানুষ হয়ে উঠবে। আর বেশি দেরি নেই বউদিদি; আবির্ভাবের ক্ষণ আসন্নপ্রায়, চোখে দেখে যাবার জন্যই বেঁচে থাকতে হবে সবাইকে। বিমলা হাসিয়া কহিল, ঠাকুরপো, একথাগুলি

বুঝি এবার নতুন শিখে এলে, না কোন নতুন বই পড়েছ? ফটিক লজ্জিতমুখে কহিল, এ আমার বিশ্বাস বউদিদি। বিমলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আমার মত অবস্থায় পড়লে, কেমন ক'রে বিশ্বাস থাকত দেখতাম! আচ্ছা, আসি। চলিবার উপক্রম করিতেই ফটিক কহিল, একটা কথা বউদিদি। আপনাকে বাঁচতে হবে। বিমলা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কেমন ক'রে শুনি? ভূপতি রায়ের হাতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে? ফটিক কহিল, না বউদিদি, আপনার যেমন অভিরুচি, তেমনই ভাবে। আমি আবার শহরে যাব, যেমন ক'রে হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করবই। যতদিন না ফিরি, ততদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। বিমলা হাসিয়া কহিল, এ কদিন কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকব ঠাকুরপো? ফটিক অপ্রতিভাবে কহিল, না না, সে কি! মাষ্টার মশায় আমাকে নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসতেন বউদিদি। আপনি তো জানেন, সে হিসাবে আমার ওপর আপনার দাবি আছে, আমারও দাবি আছে আপনার ওপর। আমাকে সব কথা বলা আপনার উচিত ছিল। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে জানলে আমি এর আগেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করতাম। আমার দেওয়া খাবার খেতে আপনার আপত্তি হ'বে না আশা করি, হ'লেও শুনব না। আজ রাত্রে আমি খাবার দিয়ে আসব। কাল মাকে ব'লে, আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত দিন-কয়েকের চাল ডাল পাঠাবার ব্যবস্থা করব। বিমলা গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল, তোমার মা দেবেন কেন? ফটিক কহিল, মাকে আপনি চেনেন না; দিদি হিংসুটে ঝগড়াটে বটে, কিন্তু মা আমার লোক ভাল; বুঝিয়ে বললেই রাজি হবেন। আর যদি নাই হন তো আমার সোনার আংটি আর বোতাম বিক্রি ক'রে সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাব। বিমলা কিছুক্ষণ ফটিকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমি চলি, ঠাকুরপো। ফটিক কহিল, আপনাদের বাইরের দরজাটা যেন খোলা থাকে বউদিদি। বিমলা জবাব না দিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি এগারোটা। পাড়াগাঁয়ে দুপুর-রাত্রি। নিজের ঘরটিতে চুপ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া ছিল বিমলা। সারাদিনের উপবাসে শরীরটা ঝিমঝিম করিতেছে। ঘর অন্ধকার; কেরোসিন গ্রামে দুর্লভ; কোনমতে দু-এক পয়সার সংগ্রহ করিতে হয়, এবং নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে লম্প জ্বালা হয় না। ঘরের ভিতরে গুমোট গরম, মশকের গুঞ্জনে মুখরিত।

বাহিরের দরজার শিকলটা টুকটুক করিয়া নড়িয়া উঠিল। বিমলা সতর্ক পায়ে বাহিরে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ফটিক দাঁড়াইয়া ছিল, হাতে পাতার ঠোঙা। বিমলা কহিল, এস। ফটিক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফটিক কহিল, আলোটা জ্বালুন; আপনি খান, আমি দেখে যাই।—বলিয়া বিমলার হাতে খাবারের ঠোঙাটি দিল। বিমলা কহিল, খাব এখন, কিন্তু এমন ক'রে কতদিন চলবে, একটা কোন ব্যবস্থা না করলে—

ফটিক কহিল, বলেছি তো, কাল যাব, একটা কিছু ব্যবস্থা না ক'রে ফিরব না। সংশয়জড়িত মৃদুকণ্ঠে বিমলা কহিল, তাড়াতাড়ি কি ব্যবস্থা হবে, এতদিনেও যখন কিছু হ'ল না! ফটিক কহিল, তাঁদের তো সব কথা বলা হয় নি; সব জানতে পারলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবেন। আপনি তাঁদের জানেন না বৌদিদি; খুব ভাল লোক তাঁরা! জনমজুরদের জন্যে কত করেন তাঁরা! বিমলা বাধা দিয়া কহিল, আমি তো আর জনমজুর নই। ভদ্রঘরের মেয়ে, আমাদের দিকে তাকাবার কেউ নেই, আর বলা-কওয়া ক'রে যদি দয়া টানতেই পার তাঁদের তো কি ব্যবস্থা করবেন, শুনি? ফটিক ঢোক গিলিয়া দ্বিধাকম্পিত স্বরে কহিল, দিদিমণি না আসা পর্য্যন্ত একটা সঠিক ব্যবস্থা হবে না বটে, তবে—। বিমলা কহিল, কি তবে?

মানে থাকবার ব্যবস্থা করা যাবে।

কোথায়?

মানে, ওঁদের তো অনেকের নিজের বাড়ি রয়েছে শহরে, কারও বাড়িতে—

বিমলা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, পাগল! আমাকে থাকতে দেবে কেন? তা কি দেয়?

এবার দৃঢ়কণ্ঠে ফটিক কহিল, যদি না দেয় তো, একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে আসব, সেখানে থাকবেন আপনি। বিমলা কহিল, একা থাকব নাকি?

ঝিয়ের ব্যবস্থা করব, ওঁরাও দেখাশুনো করবেন। আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসব। বিমলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, খরচ আসবে কোথা থেকে? ফটিক কহিল, সে আমি ব্যবস্থা করব।

অন্ধকার রাত্রি, আকাশে অগণ্য তারা, ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে, কিছু দূরে একটা গাছের ডালে একটা রাত্রিচর পাখী মিহি ও মিষ্টি স্বরে

একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে। ফটিক বিমলার মুখের দিকে চাহিল, রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলে ঘেরা সুন্দর মুখখানি বাসী ফুলের- মত মলিন শুষ্ক; সারা মুখের উপর উদ্বেগের গাঢ় ছায়া; চোখ দুটি বেদনা, সংশয় ও নিঃসহায়তার নিরাশায় ম্লান; সারা সংসারের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণায় অধরোষ্ঠ দৃঢ়নিবদ্ধ। ফটিকের মনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। সে ভুলিয়া গেল, তাহার বয়স কুড়ি, বিমলার পঁচিশ; শুধু এই কথাই মনে হইল যে, সে পুরুষ, বিমলা নারী, নির্য্যাতিতা নিঃসহায়া, একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভরশীলা। যে পুরুষ যুগ যুগ ধরিয়া নারীকে বিপদ হইতে বুক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে, অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া নারীর জন্য আহার্য্য ও পরিধেয় সংগ্রহ করিয়াছে, নারীর জন্য বাসা বাঁধিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, সেই পুরুষের সেই নব-জাগ্রত চেতনা তাহার হৃদয়কে সবল শক্তিমান, মনকে দ্বিধাহীন ও সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিল; অধিকন্তু এই অভিভাবক-হীনা নারীর ভাবী অভিভাবকত্ব ও অবশ্যম্ভাবী অবাধ ও অকুণ্ঠ সাহচর্য্যের মাধুর্য্যে তাহার অন্তরাকাশে একটি রস-ঘন বাষ্পমণ্ডলের সৃষ্টি করিল, এবং তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে আবেশের মৃদু বিদ্যুৎ-বিকাশ হইতে লাগিল।

ফটিক দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আপনি কিছু ভাববেন না বউদিদি, আমার ওপর নির্ভর করুন, আপনাকে আপনার যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।

বিমলা কহিল, তোমার মা, তোমার দিদি যদি বাধা দেয়, ভূপতি রায় অত্যাচার করে, তবে?

ফটিক ভারী গলায় কহিল, সে ভাবনা আমার, যা আমি আমার কর্ত্তব্য ব'লে স্থির করেছি—

গাঁয়ের চৌকিদার দরজার বাহিরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ইয়াদের দরজাটা খোলা কেনে গো! অ্যা! ও মুখুজ্জে মশায়, মুখুজ্জে মশায়!

চৌকিদার দরজায় ঢুকিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই বিমলা ভীত, সন্ত্রস্ত চাপা গলায় কহিল, চ'লে এস, চ'লে এস আমার ঘরে।

বিহ্বল ও বিভ্রান্ত ফটিককে একরকম ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া লইয়া বিমলা দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

চৌকিদার উঠানে আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। ও মুখুজ্জে মশায়!

যা কালা মানুষ! ও গিন্নীমা, শুনছেন! মাতঙ্গিনী হাঁকিয়া কহিল, কে র‍্যা? চৌকিদার কহিল, আমি রঙ্গলাল, বার-দরজাটা হাঁ ক'রে খোলা ছিল যে! একবার বেরিয়ে আসুন দেখি। মাতঙ্গিনী অঘোরকে উঠাইতে লাগিল, ওগো! শুনছ! একবারটা ওঠ না! রঙ্গলাল ডাকাডাকি করছে যে! বাইরের দরজাটা খোলা। অঘোর নিদ্রাজড়িত স্বরে প্রবল বিরক্তির সহিত কহিল, খোলা তো আমি কি করব? বন্ধ ক'রে দিগে যা। মাতঙ্গিনী কহিল, ও বাবা রঙ্গলাল! আর কেউ উঠনে নেই তো? দেখ দিকি ভাল ক'রে। রঙ্গলাল কহিল, উঠনে তো কাউকে দেখছি না বাবু, তবে ওই ঘরটায় কে সেঁধোল মনে হচ্ছে। মাতঙ্গিনী লম্প জ্বালিয়া বাহিরে আসিল, সভয়ে কহিল, কি বলছিস? ওই ঘরটাতে? ওটা যে বউয়ের ঘর রে, ওখানে কে সেঁধোবে আবার! তবে কি বউ বেরিয়েছিল! আয় তো দেখি। মাতঙ্গিনী বিমলার ঘরের দরজার সামনে আসিয়া হাঁক দিল, ও বউমা, বউমা! কোন সাড়া নাই। রঙ্গলালের দিকে তাকাইয়া মাতঙ্গিনী কহিল, ঘুমুচ্ছে, ও কিছু না! বার-দরজা বউমা বন্ধ করতে ভুলে গেছল বোধ হয়। রঙ্গলাল কহিল, তা কি জানি বাবু, মনে হ'ল, আবছা আবছা কে যেন ঘরে ঢুকে গেল। তা এক কাজ করুন, আপনি শিকলটা দিয়ে দেন, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনছি আমি।

মাতঙ্গিনী শিকল তুলিয়া দিল। রঙ্গলাল বাহির হইয়া গিয়া পাড়ায় হাঁকাহাকি শুরু করিল। ও মুখুজ্জে মশায়! শুনছেন! একবার উঠুন তো! অঘোর মুখুজ্জের ঘরে একটা লোক ঢুকেছে, ও চক্রবর্ত্তী মশায়!

এদিকে দরজার কাছে মুখ আনিয়া চাপা গলায় ডাক দিতে লাগিল মাতঙ্গিনী, বউমা, ও বউমা, শুনছ!

বিমলা অনেক পরে জবাব দিল, কি বলছেন?

মাতঙ্গিনী কহিল, দরজাটা খোল দেখি?

কেন?

বাইরের দরজা খোলা ছিল, রঙ্গলাল চৌকিদার বলছে; তোমার ঘরে লোক ঢুকতে দেখেছে।

বিমলা কহিল, বাজে কথা! আপনি শোন্‌গে।

মাতঙ্গিনী কহিল, দরজাটা একবার খোলই না।

বিমলা বিরক্তির স্বরে কহিল, আমি উঠতে পারছি না, আপনি বাইরের দরজাটা বন্ধ ক'রে শোন্‌গে যান।

মাতঙ্গিনী বলিতে লাগিল, ও বউ ভাল কথা বলছি শোন, রঙ্গলাল লোক ডাকতে গেছে। যদি সত্যি কেউ ঘরে থাকে তো এই সময়ে বার ক'রে দাও, সবাই এসে পড়লে কাল আর গাঁয়ে মুখ দেখানো যাবে না। তোমার হাতে কেউ জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করবে না। শুনছ, ও বউমা, ভাল কথা বলছি, শোন।

দরজা খুলিয়া দিল বিমলা। মাতঙ্গিনী ঘরে ঢুকিয়া ডিবার আলোকে ফটিককে দেখিয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, ছোঁড়া তুই! তোর এই কাণ্ড! রাত-দুপুরে বামুনের বিধবার ঘরে ঢুকেছিস? সর্ব্বাঙ্গে কুঠ হবে যে রে, ছোঁড়া! রক্ত উঠে মরবি যে! মর্, মর্, তুই। আর হ্যাঁ বউমা! আর এই মুখে এত সতীপনা কর, আর এই উঠতি-বয়সের ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই কাণ্ড! লজ্জা করে না তোমার! বামুনের ঘরের বিধবা তুমি, বাড়িতে ব'সে বেশ্যাবৃত্তি। ছিঃ ছিঃ, মুখেই শুধু তোমার তেজ। ভেতরে ভেতরে নরককুণ্ডু!

লজ্জায় ভয়ে ফটিকের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শুষ্ককণ্ঠে কহিল, বউদিদির জন্যে খাবার এনেছিলাম।

কই দেখি।— বলিয়া ঠোঙাটা বিমলার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া মাতঙ্গিনী কহিল, ঘরে খিল দিয়ে খাবার খাওয়াচ্ছিলি! হারামজাদা, বজ্জাত! কায়েতের বাচ্চা হয়ে খাবার খাইয়ে বামুনের মেয়ের সর্ব্বনাশ করছিস! হাত বাড়াইয়া কহিল, বেরো ঘর থেকে, যদি কোনদিন আর এখানে পা দিস তো তোকে মা-কালীর দিব্যি, তোর মায়ের দিব্যি। দম লইয়া কহিল, তোর যে দিদির বয়সী রে ছোঁড়া! এত কষ্ট ক'রে এতদূর না এসে ঘরে ডবকা ছুঁড়ী বিধবা বোনটার কাছে রাত কাটালেই পারিস। ডানপিটে বজ্জাত! বেরো, বেরো, কাল যাব তোর মায়ের কাছে, যেয়ে তোর ছেরাদ্দ বেঁটে আসব। খাবারের ঠোঙাটা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যা তোর খাবার, তোর মা-বোনকে খাওয়াগে যা, ছোটলোকের কুকুর, আর এ দরজায় দেখি তো চেলাকাঠ দিয়ে পা খোঁড়া ক'রে দোব।

ফটিক নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল!

বিমলা পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল, মুখ জবাফুলের মত টকটকে লাল, চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছে।

মাতঙ্গিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যা ভেবেছিলাম তাই! বামুনের বিধবা হয়ে একটা কায়েত ছোঁড়ার সঙ্গে এই কাণ্ড! ওদিকে ভূপতি রায়—মনিব, গাঁয়ের রাজা, কি না কি বলেছে, তার জন্যে এত গরগরানি!

বিমলা ধীর ও স্পষ্টভাবে কহিল, ও আমাকে খাবার দিতে এসেছিল।

মাতঙ্গিনী ব্যঙ্গ-বিকৃত কণ্ঠে কহিল, খাবার দিতে এসেছিল! কেন রাত-দুপুরে খাবার দিতে আসে? কে তোমার ও? বিমলা কহিল, আমার ভাইয়ের চেয়ে বেশি, আপনাদের মত তো ও পাষাণ নয়, নেমকহারাম নয়। দুই হাত নাড়িয়া মাতঙ্গিনী কহিল, ভাই! সব বুঝি গো বুঝি! ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না আমি; তোমাকে বুঝতে আমার বাকি নেই।

রাস্তায় অনেক লোকের কণ্ঠস্বর কানে আসিল। মাতঙ্গিনী কহিল, বক্তিমে থামিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে খিল দাও, বার থেকে শেকল তুলে দিচ্ছি আমি, এক ডাকে সাড়া দিও না। বাহিরে আসিয়া দরজা টানিয়া বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াই থামিয়া কহিল, আজকের মত তোমার মুখ রাখছি আমি, কিন্তু কালই যেয়ে বাবুর হাতে-পায়ে ধ'রে কাজে ভর্ত্তি হ'য়ো; না হলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দোব, আর ভূপতিকে ব'লে কুলোর বাতাস দিয়ে গাঁ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করব।

দরজাটা বন্ধ করিয়া শিকল তুলিয়া দিয়া মাতঙ্গিনী উঠানে আসিল। উঠানের এক ধারে খাবারের ঠোঙাটা পড়িয়া ছিল, সেইটা কুড়াইয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

রঙ্গলালের চীৎকার শোনা গেল, ওদিকে কে যাচ্ছ হে? দাঁড়াও না, আবার যায়! উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বোধ হয় দ্রুতপদে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। রঙ্গলাল সক্ষোভে কহিল, বার ক'রে দিলেক গিন্নী? দেখলেন, সড় আছে ভেতরে ভেতরে, তবে আর যেয়ে কি হবেক?

সকলে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। মাতঙ্গিনী নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইলেন, রঙ্গলাল তাহাকে কহিল, বার ক'রে দিলেন? মাতঙ্গিনী একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। দুই চোখ চাড়াইয়া কহিল, উ কি কথা রে! কাকে বার ক'রে দিলাম? সেই থেকে গাছের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছি আর ঠকঠক ক'রে কাঁপছি—

পাড়ার দুই-চারিজন প্রৌঢ়, জন দুই প্রৌঢ়া বিধবা ও জনকয়েক ছোকরা আসিয়াছিল। পুরুষদের—কি যুবা কি প্রৌঢ়—সকলেরই শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, রাত-দুপুরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসার মত উৎসাহ নাই, সামর্থ্যও নাই, নেহাৎ অত্যন্ত কৌতুকজনক একটা ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে বলিয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র মুখুজ্জে কহিল চল, চল, দরজাটা খোলা যাক।

মাতঙ্গিনী সর্ব্বসমক্ষে শিকল খুলিয়া ডাক দিল, ও বউমা! বিমলার সাড়া মিলিল না। সকলে মিলিয়া হাঁকাহাকি-ডাকাডাকি করিতেই বিমলা দরজা খুলিয়া দিল।

সকলে হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরখানি ছোট, একেবারে খালি। এক পাশে মেঝের উপর বিমলার শয্যা, ছেঁড়া মাদুর ও মলিন বালিশ। এক কোণে একটা দড়িতে বিমলার আধময়লা কাপড় ও গামছা ঝুলিতেছে; নীচেই একটা তোরঙ্গ, আর এক কোণ ঘেঁসিয়া মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া বিমলা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে।

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। দু-একজন মুখ টিপিয়া হাসিলও।

মাতঙ্গিনী অনুযোগের স্বরে কহিল, কই রে লোক? মিথ্যে সবাইকে উঠিয়ে এনে কষ্ট দিলি রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল মুখ ও হাত নাড়িয়া কহিল, মিথ্যে কি রকম? আমি নিজের চোখে লোক ঢুকতে দেখেছি এই ঘরে, তা ছাড়া এনাদেরও তো দেখিয়েছি, একটা লোক এই দিক থেকে ছুটে চ'লে গেল।

মাতঙ্গিনী কহিল, রাস্তা দিয়ে কে কোথায় গেল তাতে আমাদের কি?

আপনাদের বাইরের দরজা খোলা ছিল, তা তো আপনি দেখেছেন?

তা দেখেছি বটে, তবে দরজা বন্ধ করতে ভুল হয়ে যায় কোন কোন দিন। তা ব'লে—

মহেন্দ্র মুখুজ্জে কহিল, দেখ বউঠান, এ বড় গোলমেলে কথা! দরজা তোমার খোলা ছিল, একটা লোককে এদিক থেকে পালিয়ে যেতে আমরা দেখেছি; গড়ন-পিটনে কায়েতদের ফটকের মতই মনে হ'ল; ফটকে তো হামেশা তোমাদের

বাড়িতে আসে; তোমাদের বউয়ের সঙ্গে নাকি খুব ভাব ওর; ওরই পরামর্শে নাকি তোমার বউ বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছে, ওর সঙ্গে নাকি—

মাতঙ্গিনী বাধা দিয়া কহিল, সব মিথ্যে কথা। ফটকে সাধনের কাছে পড়ত কিনা, তাই বউকে দিদির মত ভক্তি-ছেদ্দা করে, আসে যায়, গপ্পসপ্প করে, হামেশা নয়, মাঝে মাঝে; তা ব'লে রাত-দুপুরে আসবে নাকি? বাবুদের বাড়ির কাজ তো বউ ছাড়ে নি; শরীরে অসুখ ছিল, তাই যায় নি; কাল না হয় পরশু থেকে যাবে।

একজন কহিল, ওসব কথা-কাটাকাটি ছেড়ে দেন মহেন্দ্রকাকা। পাড়ায় বসে যদি এসব কাজ চলে তো ভারি ফ্যাসাদের কথা।

মাতঙ্গিনী চোখ-মুখ ঘুরাইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, কি কাজ র‍্যা?

ঘরে লোক বসানো, গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোর মাথা খাওয়া।

মাতঙ্গিনী উঁচু পর্দ্দায় গলা উঠাইয়া কহিল, মুখ সামলে কথা বল্ বলছি এককড়ি। ভাল লোকের মেয়ের নামে দোষ দিলে জিব খ'সে যাবে তোর। পর্দ্দা নামাইয়া ধারালো গলায় কহিল, তা ছাড়া অত তড়পানো সাজে না তোর—অনেক বিত্তান্ত জানা আছে আমার।

এককড়ি রণে ভঙ্গ দিল। রঙ্গলালকে কহিল, কেন মিছামিছি আমাদের জাগালি বল্ দেখি?—সকলের মুখেই রঙ্গলালের প্রতি বিরক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সত্যই সকলের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছে রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল আমতা-আমতা করিয়া কহিল, আমি নিজের চোখে দেখলাম গো। কি জানি বাবু! কার যে মাহিত্মি, কে জানে!

মাতঙ্গিনী রঙ্গলালের দিকে জ্বলন্ত চোখে চাহিয়া সরোষে কহিল, কি বলতে চাস তুই, মুখপোড়া ডোম? যাব কাল ভূপতির কাছে, তোর বিহিত ক'রে আসব।

সকলে একে একে চলিয়া গেল।

৪

পরদিন এই কথাটা সারা পাড়ায় প্রচারিত হইয়া গেল যে, অঘোর মুখুজ্জের ভাগিনেয়-বধূর ঘরে কাল রাত্রে লোক ঢুকিয়াছিল; লোকটা খুব সম্ভব কায়স্থদের

ফটিক। হাতেনাতে তাহাকে ধরিতে পারা যায় নাই বটে, তবু রঙ্গলাল যখন নিজের চোখে দেখিয়াছে তখন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, সন্দেহ থাকিলেও কেহ সন্দেহ করিতে প্রস্তুত নয়। চণ্ডীমণ্ডপে পুরুষদের মধ্যে, পুকুরঘাটে মেয়েদের মধ্যে এই আলোচনা জোর চলিতে লাগিল। রঙ্গলাল অনেকদিনের পুরাতন চৌকিদার, বহুদিন ধরিয়া সে এই পাড়ায় পাহারা দিয়াছে; দুর্য্যোগময় অন্ধকার রাত্রেও সে পথে পথে, দ্বারে দ্বারে গৃহস্থদের সতর্ক করিয়া ফিরিয়াছে; নিস্তব্ধ নিশীথে, গাঢ় অন্ধকারের অন্তরালে, গ্রামের কত লোকের কত কীর্ত্তি তাহার চোখে পড়িয়াছে। কতবার তাহার কথা লোকে প্রথমে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু পরে তাহাই আবার নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বহু উদাহরণ পাড়ার প্রবীণেরা উত্থাপিত করিলেন।

কথাটা পাক খাইতে খাইতে যখন ফটিকের মা ও দিদির কানে পৌছিল, তখন বেলা প্রায় নয়টা। তাহারা নূতন পুকুরে স্নান করিতেছিল; ও-ঘাট হইতে মোক্ষদা হাঁকিয়া কহিল, হ্যাগা কায়েত-গিন্নী, ছেলেটিকে ধম্মের ষাঁড় করেছ নাকি? যার তার গোয়ালে ঢুকছে যে! কায়েত-গিন্নী কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, মোক্ষদার কথা শুনিয়া থামিল। মেয়ে কাছেই ছিল, কহিল, শুনছ মা! কি বলছে, খোকা নাকি ধম্মের ষাঁড়, যার তার বাড়িতে ঢুকছে! সূর্য্য-প্রণাম আপাতত স্থগিত রহিল। কায়েত-গিন্নী হাত নাড়িয়া কহিল, তেমন ছেলে আমি গর্ভে ধরি নি; আমার ছেলের মত ছেলে গাঁয়ে কটা আছে? এমন ছেলের নামে যারা কুচ্ছো রটায়, তাদের ইহকালও নেই, পরকালও নেই।

ফটিকের দিদি খনখন করিয়া কহিল, গোয়ালের গাই সাবধান ক'রে রাখলেই পারে সব। মোক্ষদা কহিল, আমি কি একা বলছি, গাঁ সুদ্ধু লোকের মুখে ওই কথা, অঘোর মুখুজ্জের বউয়ের ঘরে ঢুকেছিল তোমার ছেলে, কাল রাতের বেলায়। ফটিকের দিদির জবাবে মোক্ষদার পার্শ্ববর্ত্তিনী একটি মেয়ে কহিল, তুইও সাবধানে থাকিস লো! পরের ঘরে ঢুকতে না পেলে, তোরই ঘরে ঢুকবে শেষে। ফটিকের দিদি তিড়বিড় করিয়া উঠিয়া কলহকটু-কণ্ঠে কহিল, তোর ভাইরা বুঝি ঢোকে? তাই ও কথা বলতে মুখে বাধল না তোর?

দুই ঘাট হইতে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া বাক্যযুদ্ধ চলিল বেলা বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়া দুই পক্ষই একে একে স্নান সমাপন করিয়া ঘরে ফিরিল।

বাড়ি ফিরিয়া কোনমতে কাপড় বদলাইয়া ফটিকের মা অঘোর মুখুজ্জের বাড়ির দিকে ছুটিল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মাতঙ্গিনী বসিয়া ছিল। সকাল হইতে পাড়ার মেয়েরা একে একে আসিয়াছে। সকলেরই সেই একই ধরনের প্রশ্ন। কাল কি হয়েছিল গা? কায়েতদের ফটকে নাকি—। কথাটা শেষ হইতে না হইতেই মাতঙ্গিনীকে বলিয়া উঠিতে হয়, মিথ্যে কথা। রোঙ্গো পোড়ারমুখোর চোখে চালশে হয়েছে, কি দেখতে কি দেখেছে মিন্সে। প্রশ্নকারিণী কথাটি উপরে-নীচে নাড়িয়া কহে, তাই নাকি! তবে যে শুনলাম—তা বাবু, বউটিকে সাবধানে রেখো। সমত্থ বয়েস ফটকে ছোঁড়া যে যখন তখন আসে তোমাদের বাড়ি।

মাতঙ্গিনীকে প্রতিবাদ করিতে হয়, যখন তখন আবার কি? এক-আধবার আসে, সাধনের কাছে পড়ত কি না। বউয়ের খবরাখবর নিতে আসে, তা সেদিন মানা ক'রে দেবার পর আর আসে নি।

প্রশ্নকারিণী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে, সে কি কথা! কালও সকালে দেখেছি ওকে আসতে। মাতঙ্গিনী অপ্রতিভ হইয়া বলে, কালই মানা ক'রে দিয়েছি বটে; বলেছি, গাঁয়ের লোকের স্বভাব জান তো; পরের কু বই সু দেখে না। কে কি ব'লে বসবে, আর এসো না বাছা আমাদের বাড়িতে।

মেয়েটি ঠোঁট বাঁকাইয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, তা বেশ করেছ। তবে কি জান, চোরকে মানা করলেই হয় না, দরজায় খিল দিয়ে রাখতে হয়। আচ্ছা, আসি তবে।—বলিয়া বিদায় লয়।

মাতঙ্গিনীর রাগ হয়, গালাগালি করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু নিরুপায়ে চুপ করিয়া থাকে।

ফটিকের মা আসিয়া কহিল, হ্যাঁগা বামুন দিদি, কি সব বলছে গা?

মাতঙ্গিনী কহিল, কে তোমাকে বললে শুনি?

কেন, ওই মোক্ষদা, একঘাট লোকের সামনে যা-তা কথা বললে। আমার ছেলের মত ছেলে আছে ভূ-ভারতে? গঙ্গাজলেও খুঁত আছে, আমার ছেলে নিখুঁত।

মাতঙ্গিনীর ইচ্ছা হইল, ছেলের গুণগ্রামের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ছেলের মাকে দুই-চার কথা বেশ করিয়া শুনাইয়া দেয়, কিন্তু মনের কথা মনেই তলাইয়া দিয়া

কহিল, সব মিছে কথা। গাঁয়ের লোকের হিংসে। আমার বউ যে বাবুদের বাড়িতে কাজ করছে, আমাদের লঙ্গরখানায় পাত পাড়তে হচ্ছে না, কারও কাছে হাত পাততে হচ্ছে না, ও কি কারও সহ্যি হয়? একটা অপবাদ দিয়ে যদি কাজটি যায় তো গাঁয়ের লোকের মন ঠাণ্ডা হয়। মুখীরই লাফ-ঝাঁপটা বেশি, বউ ছুদিন কাজে যেতে পারে নি শরীর খারাপ ব'লে তো ওর মেয়ে নগাকে ডেকে নিয়ে গেছে বাবুরা, ভাবছে, বউয়ের চাকরিটি গেলে ওর মেয়েই পাবে।

ফটিকের দিদি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল, চোখ মুখ লাল, ছুই চোখ হইতে অশ্রুধারা ঝরিতেছে, ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে কহিল, মা, দেখবে এস, কি হয়েছে! খোকাকে এমন মেরেছে যে, অজ্ঞান হয়ে গেছে, নড়বার শক্তি নেই। সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে ঘরে এনেছে। ফটিকের মা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সে কি লো! কে মেরেছে? দিদি কহিল, বাবুরা ডেকে নিয়ে গিয়ে লোক দিয়ে মারিয়েছে।

ও মা আমার কি হবে! আমার একটি মাত্র শিবরাত্রির সলতে, হে ভগবান, এ কি করলে!—বলিতে বলিতে ফটিকের মা বাড়ির দিকে ছুটিল। ফটিকের দিদিও মায়ের পাছু পাছু ছুটিল।

বিমলা সকাল হইতে বাহির হয় নাই, খিল বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। মাতঙ্গিনী দরজার সামনে আসিয়া কহিল, শুনছ, ও বউ ঢং ক'রে আর ব'সে থাকতে হবে না; গা ধুয়ে এস বাবুদের বাড়ি যাও; আমি নিজে দিয়ে আসব। বাবুর পায়ে ধ'রে কেঁদে পড়লেই বাবুর দয়া হবে।

বিমলা জবাব দিল না। মাতঙ্গিনী কহিতে লাগিল, বাইরে এস না বউমা। তোমার লজ্জা দেখেই যে লোকের সন্দেহ হচ্ছে! বাইরে এসে সাধারণ লোকের মত ঘুরে ফিরে বেড়াও। কিসের লজ্জা তোমার? আমি যখন তোমাকে ভাল বলেছি, তখন যে যা বলুক কিছু এসে যাবে না। তবে আমার কাছে আর সতীপনা দেখিও না। নিজের চোখে তো সব দেখেছি। বাবু যা চায় তাই করগে; এক ঘাটে যখন মাথা মুড়িয়েছ, তখন সব ঘাটই তো তোমার খোলা। বাজারে বসার অনেক দুঃখ; বড়লোকের হিল্লে ধরলে চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে, আমাদেরও একটা হিল্লে হবে।

এত যে ব্যাপার বাড়িতে অঘোর কিছুই শুনে নাই; চুপ করিয়া বিছানায়

বসিয়া ছিল, ডাক দিয়া কহিল, শুনছ, চা-টা কিছু দেবে, গলাটা শুকিয়ে গেল যে? বউমা কোথায় গেল? বাবুদের বাড়ি গেছে, না আজও গোঁ ধ'রে বসে আছে?

মাতঙ্গিনী কাছে আসিয়া কহিল, চা আজ নেই ঘরে। অঘোর বিরক্তির স্বরে কহিল, কি ক'রে থাকবে? কাল ফটকে দিতে এসেছিল, বাহাদুরি ক'রে ফেলে দিলি। এখন খাব কি? পেট জ্ব'লে যাচ্ছে আমার।

মাতঙ্গিনী কহিল, দিচ্ছি দিচ্ছি, চোখ-কানের মাথা খেয়ে বেশ আছ তুমি! কিছু দেখতে শুনতে হয় না, কেবল খাবার সময় হাঁক-ডাক; কি ক'রে যে খাবার আসবে তার চিন্তা নেই।—বলিয়া কাল রাত্রে তুলিয়া রাখা ফটিকের আনা রুটি আর গুড় মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, নেমে এস খাও।

ক্ষীরোদা আসিয়া ডাক দিল, বামুন-খুড়ী রইছ নাকি গো! আপ্যায়নের স্বরে মাতঙ্গিনী কহিল, আয় মা ক্ষীরোদা, আয়।—বলিয়া একেবারে দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীরোদা দরজার সামনে আসিয়া কহিল, বামুনকাকাকে দেখছি নে? মাতঙ্গিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, ঘরেই তো রয়েছে। সকাল থেকে ক্ষিদে ক্ষিদে করছিল তাই চারিটি দিলাম খেতে। বুড়িয়ে ক্ষিদে চার গুণ বেড়েছে মা; ওর জন্যেই আমার মরণ। ক্ষীরোদা কহিল, বুড়ো বয়সে এটিই তো থাকে খুড়ী। না হ'লে এত ভাবনা কিসের।—বলিয়া মুখ বাড়াইয়া অঘোরকে রুটি খাইতে দেখিয়া কহিল, রুটি কোথায় পেলে গো? মাতঙ্গিনী আমতা আমতা করিয়া কহিল, ঘরে দুটি ময়দা প'ড়ে ছিল, তাই দিলাম ক'রে দুখানা বুড়োকে। মুখ মুচকাইয়া ক্ষীরোদা কহিল, তাই! তোমাদের অবস্থা ভাল গো! ঘরে ময়দা রয়েছে, গুড় রয়েছে। তাই তোমার বউটির এত তেজ! বউ কোথায়?

ঝঙ্কার দিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, বলিস না মা! ওকে নিয়েই আমি গেলাম। লজ্জায় ঘর বন্ধ ক'রে ব'সে আছে সকাল থেকে। তোর যখন কোন দোষ নেই, কিসের লজ্জা তোর? আমি ভগবানের দিব্যি বলছি ক্ষীরোদা! বউ বেহেড একগুঁয়ে বটে, কিন্তু ছিনাল নয়।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ক্ষীরোদা কহিল, তা বটে। মাতঙ্গিনী চোখ দুইটি ছোট করিয়া কহিল, হাসলি যে? মুখ চোখ ঘুরাইয়া ক্ষীরোদা কহিল, কি জানি বাপু! কত লোক কত রকম বলছে! বাবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে; সকাল থেকে

রেগে আগুন হয়ে আছে বাবু। নিজের রাজত্বতে এই সব অনাচার! ফটককে ডেকে পাঠিয়েছিল; ছোঁড়াটা তো তোমার বউয়ের চেয়েও বেহেড, বাবুর মুখের ওপর কি কথা বলেছিল তো বাবু ফকরে ডোমকে দিয়ে এমন মার দিয়েছে যে, গরুর মার। হাড়-গোড় ভেঙে গেছে ছোঁড়ার, হালিম খাওয়াতে হবে। বাপ দু মাস ধান বেঁধে রেখে গেছে কিনা, তাই ছোঁড়ার তড়বড়ানি। প্রজা হয়ে রাজার ওপর চোখ রাঙায়! ঘরের চাল কেটে গাঁ থেকে যদি তুলে দেয় বাবু, তো কোথায় যাবে তার ঠিক নেই।

মাতঙ্গিনী ভয়ে ভয়ে কহিল, হ্যা লা! ফটকের কি দোষ? ক্ষীরোদা বলিল, ফটকেই তো ঘরে ছিল, সবাই বলছে। মাতঙ্গিনী কহিল, মিথ্যে কথা, বিষ্ণুর ফুল ছুঁয়ে বলব আমি বাবুর সামনে। সবাই দেখেছে, ঘরে কেউ ছিল না। ক্ষীরোদা নীরস স্বরে কহিল, তা কি জানি বাপু। চল একবার বাবুর কাছে।

অঘোর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটি বিড়ি ধরাইয়াছিল। মাতঙ্গিনী কহিল, শুনছ, বাবু কি জন্য ডেকে পাঠিয়েছে, যাও না! অঘোর কহিল, কেন? মাতঙ্গিনী কহিল, কি ক'রে জানব? চল না, ধীরে ধীরে নিয়ে যাই। হাত নাড়িয়া অঘোর কহিল, আমি কানা কালা মানুষ, আমি যেয়ে কি করব? তুই যা। মাতঙ্গিনী নাকী স্বরে কহিল, দেখ্ দিকি মা! আমার হয়েছে জ্বালা! মেয়েমানুষ হয়ে আমি কত দিক সামলাই?

৫

বাগান-বাড়ির বারাণ্ডায় একটা খাটিয়ায় বসিয়া ছিল ভূপতি। আশেপাশে মোসাহেবের দল, পাড়ার ও অন্যান্য পাড়ার মধ্যবয়সী লোক সব, জনকয়েক অল্পবয়স্কা ঝি ও মালী। বাগানে পাকা ও আধপাকা বিস্তর আম পাড়া হইয়াছে। বাড়ির বিভিন্ন মহলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন মহলের ঝিরা ঝুড়িতে ভূপতির আদেশমত আম তুলিতেছে। মোসাহেবের দল সতৃষ্ণ নয়নে পাকা আম ও কাঁচা বয়সের ঝিদের দিকে তাকাইয়া আছে।

বড়গিন্নীর (ভূপতির মা) মহলের ঝি আম লইয়া চলিয়া গেল; গিন্নীর (ভূপতির স্ত্রী) আম লইয়া গেল ক্ষীরোদার সহকারিণী, তাহার নিজের ছোট বোন নীরদা; ভূপতির ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ছোটগিন্নীর মহলের আম লইয়া গেল

তাঁহার খাস-ঝি, আর একটি মেয়ে; ঝি-চাকরদের আমও চলিয়া গেল। বাকি রহিল মোসাহেবেরা; মালী বাকি আমগুলি তাহাদের ভাগ করিয়া দিতে লাগিল।

এমন সময়ে ক্ষীরোদার সঙ্গে মাতঙ্গিনী আসিল। ভূপতি একবার তাহার দিকে তাকাইয়া আবার আম্র-বণ্টনের দিকে মনোনিবেশ করিল।

মোসাহেবের দল তখন আমগুলার উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য মালীর ও তস্য মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

ভূপতি কহিল, আজ এই নিয়েই যাও হে সব, কাল আবার হবে; একদিনেই ফুরিয়ে গেল নাকি? সকলে দেঁতো হাসি হাসিয়া কহিল, তা বটে। নিজ নিজ অংশের আম কোঁচড়ে পুরিয়া কহিল, সাত পুরুষ ধ'রে আম খেয়ে আসছি আমরা, আমাদেরও একটা স্বত্ব জন্মে গেছে যে! ছেলে-মেয়েগুলোও তা জানে, বোল হতে না হতেই জিবে জল ঝরতে শুরু করে তাদের। ভূপতি কহিল, কবে পাও না হে তোমরা, অ্যাঁ? সকলে তোষামোদের স্বরে কহিল, সে কথা বটে; কবে পাই না আমরা? একজন আবদারের সুরে কহিল, কাল কিন্তু মিছরিদানা গাছের আম পেড়ো বনমালী। (মালীর নাম বনমালী।) নাম সার্থক, ছোট ছোট আম, কিন্তু মিছরির চেয়ে মিষ্টি। আর একজন কহিল, সত্যি, গিন্নী কাল বলছিল বটে। ওর আবার এ সময়টা ভাল-মন্দ খেতে ইচ্ছে কচ্ছে কিনা। বলছিল, মিছরিদানা গাছের আম খেতে ইচ্ছে কচ্ছে, বাবুকে ব'লো গিয়ে। ভূপতি গম্ভীর হইয়া কহিল, আচ্ছা, এখন এস তোমরা, আমার একটু কাজ আছে।

সকলে মাতঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত চলিয়া গেল।

ভূপতি কড়া গলায় মাতঙ্গিনীকে কহিল, তোমাকে ভাল মানুষ ব'লে জানতাম, এখন দেখছি, বজ্জাতি বুদ্ধি তোমার কম নয়। মাতঙ্গিনী কহিল, কেন বাবা? কি করলাম আমি? ক্ষীরোদা পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ভূপতি কহিল, ক্ষীরোদা, তুই যা, আম পাঠিয়ে দিয়েছি, গুনে-গেঁথে রাখ্‌গে যা। ক্ষীরোদা চলিয়া গেলে ভূপতি কহিল, কাল রাত্রে ফটকে তোমার বউয়ের ঘরে ঢুকেছিল? মাতঙ্গিনী কহিল, মিথ্যে কথা। ভূপতি ধমকাইয়া কহিল, মিথ্যে কথা! রঙ্গলাল নিজের

চোখে দেখেছে। মিথ্যে কথা? মাতঙ্গিনী কহিল, রঙ্গলাল কি দেখতে কি দেখেছে! ভূপতি জোর দিয়া কহিল, ঠিক দেখেছে; তুমিই শেকল খুলে ফটকেকে বার ক'রে দিয়েছ।

ঠিক সামনে, রাধা-সায়রের অপর পাড়ে, বিষ্ণুমন্দিরের পিত্তলনির্ম্মিত চূড়া সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে বলছি বাবা, সব মিথ্যে।

ভূপতি গুম হইয়া বসিয়া রহিল। সকালে এত মার খাইয়াও ফটিক ওই একই কথাই বলিয়াছে, সব মিথ্যা। তবে কি রঙ্গলালই ভুল করিয়াছে? ক্ষীরোদা তো বলেছে যে, কাল সন্ধ্যায় বিমলা ও ফটিককে অন্ধকারে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়াছে। তবে? ভূপতি কহিল, তবে যে ফটকে বললে, সে ঢুকেছিল, তুমি শেকল খুলে বার ক'রে দিয়েছ তাকে? মাতঙ্গিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বার কয়েক ঢোক গিলিল। ভূপতি কহিল, বুড়ী হয়ে মরতে যাচ্ছ, এখনও পরকালের ভয় নেই? বিষ্ণুমন্দিরের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা! মাতঙ্গিনী কহিল, ফটিক মিথ্যে কথা বলেছে বাবা। আমি কাউকে বার ক'রে দিই নি। মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর নকল করিয়া ভূপতি কহিল, আমি কাউকে বার ক'রে দিই নি! কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া কহিল, দিয়েছ কি না দিয়েছ, দেখছি আমি। বনমালীকে ডাক দিয়া কহিল, ফকরেকে ডাক তো। ফকরে অর্থাৎ ফকির ডোম, কাছারির পাইক।

বহুপুরুষ ধরিয়া এই গ্রামে কয়েক ঘর তেঁতুলে-ডোম জমিদারের আশ্রয়ে বাস করিতেছে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর জমিদারের সরকারে পাইক-বরকন্দাজের কাজ করিয়াছে; ডাকাতি করিয়া জমিদারের ধন-বৃদ্ধি করিয়াছে; জমিদারির রক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুন-জখম করিয়াছে; উৎসবে ও পর্ব্বে লাঠি খেলিয়া ও ব্যায়ামের বিচিত্র কসরৎ দেখাইয়া জমিদার ও তাঁহার আহূত কুটুম্ব ও বন্ধুদের মনোরঞ্জন করিয়াছে, আব মেয়েরা যৌবনকালে দেহ দান করিয়া জমিদার-নন্দনদের আনন্দ দান করিয়াছে। জমিদারের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবস্থা হীন হইয়াছে—শারীরিক আর্থিক দুইই। শরীর-চর্চ্চা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, পুরুষেরা অনেকেই জন-মজুরের কাজ করিতেছে, দুই-চারিজন যাহাদের দেহে শক্তি-সামর্থ্য আছে, তাহারাই জমিদারের সরকারে কাজ করিতেছে।

রঙ্গলাল ও ফকির দুইজনেই তেঁতুলে-ডোম, রঙ্গলাল চৌকিদার, ফকির কাছারির পাইক।

ফকির আসিয়া হাজির হইল, বেঁটে গাঁট্টাগাঁট্টা চেহারা, মিশমিশে কালো রঙ। সারা মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখ কানা, কপালের এক পাশে আড়াআড়ি একটা কাটার দাগ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল; থ্যাবড়া নাকের নীচে খোঁচা খোঁচা গোঁফ। মাতঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া অপরিচ্ছন্ন ফাঁক-ফাঁক দাঁত বাহির করিয়া হাসিল।

ভূপতি কহিল, এই মাগীকে নিয়ে যাতো। ফটকেকে যেমন করেছিলি না, তেমনই একটু ঠাণ্ডা ক'রে দে।

ফকিরের যমদূতের মত চেহারা দেখিয়া মাতঙ্গিনীর বুকের রক্ত জল হইয়া গেল। ফকির কুতকুতে চোখ দুইটা চাড়াইয়া কহিল, কি গো, যাবে নাকি ?—বলিয়া দুই পা আগাইতেই মাতঙ্গিনী ভূপতির পায়ের কাছে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, হেই বাবা ভূপতি! ওকে আসতে মানা কর, বামুনের মেয়েকে ডোমের হাতে অপমান করিও না বাবা।

ভূপতি কটুকণ্ঠে কহিল, ভারি খিঁচ কাটছ যে, একটু সোজা করা দরকার তোমাকে।

মাতঙ্গিনী মিনতি করিয়া কহিল, না বাবা, ওকে যেতে বল, যা বলবার আমি বলছি। ভূপতি ফকিরকে চোখের ইঙ্গিতে কহিল, যা তুই।

মাতঙ্গিনী উবু হইয়া বসিয়া কতকটা সামলাইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, ফটকে এসেছিল বাবা, তবে কোন বদ মতলবে নয়। বাঁকা হাসিয়া ধারালো কণ্ঠে ভূপতি কহিল, সাধু মতলবটা কি শুনি ? চণ্ডীপাঠ ক'রে শুনিয়ে গেল বুঝি ?

না বাবা, ফটকে বাইরে কি করে জানি না, বউকে নিজের দিদির মত ভক্তি-ছেদ্দা করে, সাধনের কাছে পড়েছিল কিনা—

ভূপতি রাগে হিংসায় মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ভক্তি-ছেদ্দা করে। তাই রাতদুপুরে ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে ভক্তি দেখাচ্ছিল! কঠোর কণ্ঠে কহিল, কত ক'রে দিন পাচ্ছ বল দেখি ? বিড়ি-চা নাকি বুড়োকে খাওয়ায়, ধুতি-শাড়ি নাকি কিনে দিয়েছে তোমাদের, বিনা পয়সায় তোমাদের চাল দেওয়াবারও চেষ্টা করেছিল—আমার জন্যে পারে নি। তা—। চোখ দুইটা কুঁচকাইয়া ছোট

করিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা টাকা বাজাইবার মুদ্রা করিয়া কহিল, নগদ কিছু ক'রে দিচ্ছে নাকি? মাতঙ্গিনী কহিল, ওসব কথা ব'লো না বাবা। কাল সারাদিন বউকে কিছু খেতে দিই নি, তুমি মানা করেছ ব'লে; তাই খাবার দিতে এসেছিল।

তির্য্যক ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, খবরটা দিয়েছিল কে? মাতঙ্গিনী কহিল, জানি না বাবা। গর্জ্জন করিয়া ভূপতি কহিল, জান না? রোজ সন্ধ্যেবেলায় জল আনবার ছল ক'রে ফটকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাঠিয়ে দাও। মাতঙ্গিনী আকাশ হইতে পড়িল; দুই চোখ বড় করিয়া বিস্ময়ের স্বরে কহিল, ও কি কথা বাবা! ভূপতি কহিল, ও কি কথা বাবা। ক্ষীরোদা নিজের চোখে দেখেছে কাল সন্ধ্যেবেলায় তোমার বউ আর ফটককে কথা বলতে। মাতঙ্গিনী নাকী সুরে কহিল, কাল নিজে থেকে গিছল বাবা, আমি মানা করেছিলাম, আমার মানা শোনে না আজকাল। ভূপতি কহিল, শুনবে কেন? পয়সার লোভে ব্যবসা শুরু করিয়েছ, বুক বেড়ে গেছে ওর; এর পর শহরে গিয়ে ফালাও ক'রে ব্যবসা ফাঁদতে চায়, আমার কাছে ছিল, দু-মুঠো খেতে পাচ্ছিলে। লোভের তো সীমা নেই তোমাদের; বোঁটা সুদ্ধু গিলতে চাইলে। বোঝ মজাটা। মুখে লাথি মেরে চ'লে যাবে ফটকের সঙ্গে। আর ফটকে ভাবছে, ওর কাছেই থাকবে চিরকাল। ওকেও লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক জোটাবে সেখানে। মাতঙ্গিনী হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হেই বাবা ভূপতি, এর বিহিত কর বাবা। ভূপতি বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, বিহিত করব বইকি। আমি জমিদার ভূপতি রায়, চুপ ক'রে সহ্য করব না কি? তোমাদের গাঁ থেকে তাড়াব, ফটককে ঢিট ক'রে দোব, আর ওই মাগীকে ছোটলোক দিয়ে বেইজ্জত করিয়ে নাক কান কেটে গাঁ থেকে বিদেয় করব।

ফটিকের মা আসিয়া হাজির হইল। কাঁদিয়া চোখ দুইটা ফুলিয়া গিয়াছে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ বাবা ভূপতি, এমন ক'রে মারতে হয় বাবা? কি অপরাধ করেছে আমার ছেলে?

ভূপতি হাঁকিয়া কহিল, যাও, যাও। ছেলের জন্যে আর বলতে হবে না। কি করেছে জিজ্ঞেস কর একে।—বলিয়া মাতঙ্গিনীকে দেখাইয়া দিল। ফটিকের

মা কলহের সুরে মাতঙ্গিনীকে কহিল, কি করেছে গা? তখন তো বললে, সব মিছে কথা। মাতঙ্গিনী কলহের সুরে কহিল, আমার কাছে জেনে কি হবে, ছেলেকেই জিজ্ঞেস করগে।

ভূপতি কহিল, এর বিধবা বৌয়ের ঘরে ঢুকেছিল কাল। এই অপরাধে শাস্তি ওর কিছু হয় নি। ঘর জ্বালিয়ে উদ্বাস্তু ক'রে, তোমাদের চোখের সামনে তোমার বিধবা মেয়েটাকে ছোটলোক দিয়ে বেইজ্জত করলে, তবে ওর শাস্তি হয়। ফটিকের মা কহিল, আমার ছেলে নির্দোষী বাবা। ওই বউটাই হয়তো ছলা-কলা ক'রে ওর মন ভুলিয়েছে, তবু আমার ছেলে কোন মন্দ কাজ করবে—আমার বিশ্বাস হয় না। ভূপতি অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাইয়া পরুষকণ্ঠে তীব্র শ্লেষের সুরে কহিল, খুব ভাল ছেলে তোমার। বাউরী-বাগদীপাড়ার কীর্ত্তি আমার জানতে বাকি নেই। সব চুপ ক'রে দেখে এসেছি এতদিন। বাড় বেড়েই চলেছে দিন দিন। ভুরু দুইটা নাচাইয়া কহিল, বেশি না ব'কে বাড়ি চ'লে যাও, ছেলেকে সামলে রাখগে, না হ'লে বিপদে প'ড়ে যাবে একদিন। ফটিকের মা কহিল, তা ব'লে এমন মার বাবা—, লোকে গরু-ছাগলকে এমন মার মারে না। উঠতে পারছে না, জ্বর এসে গেছে। ভূপতি রাগিয়া উঠিয়া কহিল, ফ্যাচফ্যাচ ক'রো না, যাও, আমার প্রজা-পাঠক খেপাচ্ছে, ছোটলোকগুলোকে নাচাচ্ছে, পাড়ার বউ-ঝি নষ্ট করছে, ওকে মারবে না তো কোলে ক'রে আদর করবে? তা ছাড়া এখনই হয়েছে কি ওর? সব কথা শুনি আগে, তারপর গাঁ থেকে তাড়াব তোমাদের।

ফটিকের মা ভয়ে ভয়ে কিছুক্ষণ ভূপতির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

ফটিকের মা যাইতেই ভূপতি মাতঙ্গিনীকে কহিল, তুমি আর ব'সে আছ কেন গো? স'রে পড় না। মাতঙ্গিনী কহিল, বাবা, তুমি গাঁয়ের রাজা, দুষ্টের তুমি দমন করবে বইকি বাবা। ফটকেটা বজ্জাত, ওকে শাস্তি দাও যা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা বুড়োবুড়ী কি দোষ করেছি? ভূপতি কহিল, শেকল খুলে ফটকেকে বার ক'রে দিয়েছিল কে? তুমি, না গাঁয়ের আর কেউ? মাতঙ্গিনী ঢোক গিলিয়া কহিল, আমিই বাবা। গাঁয়ে একটা কেলেঙ্কারি র'টে গেলে পাছে তোমার বাড়ির চাকরিটি না থাকে, তাই করেছি বাবা, নইলে অন্য কোন মতলব ছিল না। ভূপতি কহিল, কেলেঙ্কারির কিছু বাকি আছে নাকি? যা হবার তা হয়েছে, রঙ্গ-

লালের কথা গাঁয়ের কেউ অবিশ্বাস করে নি। আর চাকরি? তোমার বউকে তো রাখা আর চলবে না, ওর হাতে খাবে কে? মাতঙ্গিনী ক্রন্দন-জড়িত স্বরে কহিল, তবে কি করব বাবা? ভূপতি ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, তোমাদের আর ভাবনা কি গো! বউকে নিয়ে শহরে যাবে, সেখানে দোকান ক'রে বসিয়ে দেবে। তোমাদেরই ভাত খায় কে? মাতঙ্গিনী কহিল, ও কথা ব'লো না বাবা। চিরদিন তোমাদের আশ্রয়েই আছি, এখান থেকে এক পা নড়ব না আমরা; আমাদের মারতে হয় মার, রাখতে হয় রাখ; বউটাকেও তোমারই হাতে স'পে দিচ্ছি। ওকে যা শাস্তি ইচ্ছে হয় দিয়ে তোমার কাছেই রাখ বাবা। রাঁধুনীর চাকরি না হয়, ঝিয়ের কাজ দাও। তোমার শাসনে থাকলে ও ঠিক থাকবে, না হ'লে ব'য়ে যাবে। ভূপতি গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, বউকে সন্ধ্যের পর পাঠিয়ে দিও। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানি কি ব্যাপার! যদি তেমন বুঝি, আর ভালভাবে থাকবে বলে, তো রাখব আমার বাড়িতে; ক্ষীরোদারা যেমন আছে, তেমনই থাকবে। মাতঙ্গিনী কহিল, আমাদের কি হবে বাবা?

ভূপতি ভারী গলায় কহিল, তোমাদেরও ব্যবস্থা হবে, আচ্ছা, যাও এখন।—. বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চটিজুতায় পা গলাইল। মাতঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিল, বাবা, আজকের চাল—। ভূপতি চলিতে উপক্রম করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চাল কিসের? চাল-টাল নেই, যাও। মাতঙ্গিনী হাতজোড় করিয়া কহিল, হেই বাবা! দাও চারটি, না হ'লে বুড়োটা ম'রে যাবে। ভূপতি কহিল, ম'রে যায় তো আমার কি? কিসের জন্যে খাওয়াব তোমাদের? কি লাভ আমার? মাতঙ্গিনী মুখের ভাব যথাসম্ভব করুণ করিয়া যুক্তহস্তে ভূপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মাতঙ্গিনীর মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ভূপতি কহিল, জ্বালাতন! ওরে বনমালী, লঙ্গরখানার চালের থেকে দে তো আধ সের চাল।

মাতঙ্গিনী কহিতে লাগিল, বেঁচে থাক বাবা। বাড়-বাড়ন্ত হোক তোমার। বউকে সন্ধ্যের পরেই পাঠিয়ে দোব, ফটকেই ওর মাথা খারাপ করেছে বাবা! নইলে ওর কি সাহস! তুমি চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখালেই, যা বলবে তাই করবে ও।

বনমালী আসিয়া মাতঙ্গিনীর আঁচলে চাল ঢালিয়া দিল। মাতঙ্গিনী কহিল,

বাবা, গোটা দুই আম—বুড়োটার ভারি নোলা বেড়েছে বাবা! কদিনই বা বাঁচবে, ভালমন্দ তো কিছুই খেতে পায় না।

ভূপতি বনমালীকে কহিল, দে ওকে দুটো আম। মাতঙ্গিনী কহিল, বউকে কি চারটি ভাত খেতে দোব আজ? ভূপতি কহিল, কাল তো ফটকে খাইয়ে গেছে বলছ, আজ আবার কেন? মাতঙ্গিনী কহিল, সে খাবার আমি ফেলে দিয়েছিলাম বাবা। বউ কিছুই খায় নি। ভূপতি কহিল, তাই নাকি? তা হোক, দিও না খেতে; একটু রস মরুক ওর। সন্ধ্যের পরে পাঠিয়ে দিও, যদি মতি-গতি ভাল দেখি, আমিই খাবার ব্যবস্থা ক'রে দোব। আর দেখ, যদি না আসতে চায় তো ব'লে দিও, ফকরে ডোম গিয়ে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে আসবে। আর এমন শাস্তি দোব যে, জীবনে ভুলবে না কোনদিন।

৬

মাতঙ্গিনী যখন বাড়ি ফিরিল, তখন বেলা প্রায় একটা। উঠানে কড়া রোদ; শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় বিমলা বসিয়া ছিল। দুই দিনের উপবাসে মুখখানা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বড় বড় চোখ আরও বড় দেখাইতেছে; চোখের কোণে সুস্পষ্ট কালো দাগ; মাথার চুল এলোমেলো; উবু হইয়া হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া ছিল; কাপড়ের আঁচলখানা পাশে মেঝের উপর লুটাইতেছে!

মাতঙ্গিনী কহিল ফটকে সব স্বীকার করেছে; আমাকেও করতে হ'ল, তবু যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে এসেছি তোমাকে। তবে তোমার মুখ থেকে সব কথা বাবু নিজের কানে শুনতে চায়; সন্ধ্যের পর যেতে বলেছে তোমাকে; হাতে পায়ে ধ'রে বুঝিয়ে ব'লো বাবুকে; কান্নাকাটি ক'রো যতটা পার। যদি মন নরম করতে পার বাবুর, তো ওই বাড়িতেই আবার চাকরি পাবে, না পার তো অপমান ক'রে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবে। একটু চুপ করিয়া কহিল, পইপই ক'রে বলছি, যেও ঠিক, না হ'লে বাবু বলেছে ফকরে ডোমকে দিয়ে ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে যাবে, আর যা ইচ্ছে তাই অপমান করবে। বিমলা চুপ করিয়া রহিল। মাতঙ্গিনী কহিল, আর ঢং ক'রে ব'সে থাকলে কেন? যাও, চান ক'রে এসগে। আজও অদেষ্টে খাওয়া নেই তোমার। বাবু মানা করেছে, বলেছে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, খেতে দেবার যোগ্যি হয়, তো আমিই খেতে দোব।

মাতঙ্গিনী নিজের মনেই গজগজ করিতে লাগিল, আমি জানি বেহেড হোক, ঝগড়াটে হোক, ভাল মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে চার-পাঁচ বছর ঘর করেছে। এমন স্বামী! এদিকে তলে তলে এতদূর এগিয়েছে, কে জানে বাপু! রাতে নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোই, ভাবি, বউ আমার ঠিক আছে, রেতে যে ঘরে লোক ঢোকাচ্ছে কি করে জানব আমি? বিমলার দিকে তাকাইয়া কহিল, হ্যাঁগা, কত দিন থেকে আসছে বলতে পার? বিমলা ভগ্নকটি সর্পিনীর মত তীব্র দৃষ্টিতে একবার মাতঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া আবার চোখ নামাইয়া লইল। মাতঙ্গিনী শ্লেষের স্বরে কহিল, নজ্জাশীলার নজ্জা করছে! ভাইয়ের বয়সী ছেলেটার সঙ্গে নষ্টামী করবার সময়ে নজ্জা করে নি?

আরও কিছুক্ষণ পরে মাতঙ্গিনী বিমলাকে কহিল, যাও না চান করতে, ব'সে রইলে কেন? এখন ঘাটে কেউ নেই। আর থাকলেই বা করবে কি? কেউ কিছু বলে, মুখ নামিয়ে চুপ ক'রে থেকো।

বিমলা উঠিয়া জলের কলসীটা লইতে যাইবা মাত্র মাতঙ্গিনী হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। থাক্ থাক্; ওটা আর ছুঁয়োনা, জল রয়েছে ওতে, ভাত রান্না করতে হবে, জল দরকার হয় আমি আনব এখন, তুমি ওই ছোট কলসীটা নিয়ে গিয়ে নিজের জল আনগে।—বলিয়া রান্নাঘর হইতে একটা ছোট মাটির কলসী বাহির করিয়া দিল। বিমলা মুখ লাল করিয়া নীরবে কলসীটা তুলিয়া লইল।

বাড়ি ফিরিয়া রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বিমলা মাতঙ্গিনীকে কহিল, দুটো পয়সা দিতে পারেন?

মাতঙ্গিনী উনানের সামনে পা মেলিয়া বসিয়া এতক্ষণ কাল রাত্রে ফটিকের আনা রুটির দু-একখানা যা পড়িয়া ছিল, খাইতেছিল; বিমলার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইতেই বাকি রুটিখানা মুখে পুরিয়া যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; বিমলা দরজার সামনে আসিতেই ঢকঢক করিয়া জল গিলিয়া রুটির দলাটাকে কণ্ঠনালীর মধ্যে পার করিয়া দিয়া বিমলার প্রশ্নের জবাবে কহিল, পয়সা কোথায় পাব? মাসে তো দুটি টাকা, তাতেই নুন, তেল, কাঠ, কেরোসিন, আরও কত কি! আমি ব'লে তাই চালাই।

বিমলা সতৃষ্ণ নয়নে ফুটন্ত ভাতের দিকে তাকাইয়া ছিল; ফেনের সোঁদা গন্ধ নাকে আসিতেই পেটের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিল তাহার। মাতঙ্গিনী কহিল,

অমন ক'রে তাকিও না বউ, ও ভাত হজম হবে না আমাদের ; এর থেকে এক মুঠোও দেওয়া চলবে না তোমাকে, ভূপতি মানা করেছে ; বলেছে, ফেন পর্য্যন্ত যেন না দেওয়া হয়।

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, উনোনটা একবার ছেড়ে দিন তা হ'লে। মাতঙ্গিনী বিস্ময়ের স্বরে কহিল, উনোন নিয়ে কি করবে তুমি? চাল-ডাল বুঝি ফটকে কাল দিয়ে গেছে? বিমলা কহিল, একটু চা ক'রে নোব। মাতঙ্গিনী কহিল, চা কোথায় পেলে?

বিমলা কহিল, তোরঙ্গের এক কোণায় চারটি প'ড়ে ছিল। মাতঙ্গিনী চোখ দুইটা গোল করিয়া, মুখ ঘুরাইয়া কহিল, তুমি মেয়ে মানুষ না পাষাণ বউ? দয়া-মায়া ছেদ্দা-ভক্তির পাট কি একেবারেই চুকিয়ে দিয়েছ? বাপের তুল্যি শ্বশুর তোমার, একটু চায়ের জন্যে সারা সকালটা কাটা ছাগলের মত কাতরালে ; পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে যে শুনতে পাও নি তা নয় ; বুক ধ'রে বার ক'রে দিতে পারলে না? নিজেরটাই এত বুঝেছ বউ এই বয়েসে? বিমলার বলিতে ইচ্ছা হইল, নিজেরটা বুঝি বলিযাই তো এই দুর্দ্দশা। কিন্তু তাহা না বলিয়া কহিল, ভাতটা হয়ে গেলে উনোনটা ছেড়ে দেবেন তা হ'লে।

মাতঙ্গিনী মাথাটা সজোরে নাড়িয়া কহিল, না না, উনোন ছুঁতে দিতে পারব না তোমাকে। বিমলা শুষ্ককণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, কি করেছি আমি যে, আমাকে এত ঘেন্না? মাতঙ্গিনী খনখন করিয়া কহিল, কি করেছ তা খুব ভাল ক'রেই জান বউ। এত অভাবেও এতটুকু অনাচার করি নি আমরা, তোমার সঙ্গে ছোঁয়া-লেপা ক'রে কি জাত-জন্ম খোয়াব?

বিমলা করুণকণ্ঠে কহিল, তা হ'লে তো আমার মরাই ভাল। মাতঙ্গিনী অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া কহিল, মরতে তুমি পারবে না বউ, পারলে কাল রাতেই মরতে, আজ আর ও মুখ কাউকে দেখাতে না! মরা কি এত সোজা বউ! খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মরবারই বা দরকার কি তোমার? বাবুর কাছে যাও, হাতে-পায়ে ধ'রে মাপ চাওগে ; কাজ পাবে, খেতে-পরতে পাবে, সুখে-সচ্ছন্দে থাকবে। এই বয়সে ম'রে কি হবে তোমার?

বিমলা কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিল, চায়ের পাতা কয়টা চিবাইয়া ঢকঢক করিয়া কতকটা জল গিলিয়া, দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া, খালি মেঝের উপর

শুইয়া পড়িল। মাতঙ্গিনীর কথাগুলা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসিতে লাগিল। মরতে তুমি পারবে না, পারলে কাল রাতেই মরতে, মরা কি এত সোজা বউ।

সত্য! সে মরিল না কেন? কাল রাত্রে যখন সকলে চলিয়া গেল, মাতঙ্গিনী শেষবার তাহাকে গালাগালি করিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া শুইতে গেল, তখন ইচ্ছা করিলে সে অনায়াসে মরিতে পারিত। নিঃসাড় রাত্রি, পাড়ার কেহ জাগিয়া ছিল না; রঙ্গলালও পাহারা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে যদি তখন নূতন পুকুরের জলে গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিত, কে বাধা দিত? আজ এতক্ষণ সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিত; সারা গ্রামের লোক পুকুরের পাড়ে আসিয়া জড় হইত; ভূপতি রায় জেলে ডাকাইয়া তাহার দেহ পাড়ে তোলাইত। যে দেহকে ভোগ করিবার জন্য ভূপতি পশুর মত নিষ্ঠুর নির্ব্বিচার লালসায় লেলিহান হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই বিকৃত, বীভৎস আকৃতি দেখিয়া সে ঘৃণায় পিছাইয়া যাইত। পাড়ার মেয়ে-পুরুষ কুৎসার কালিতে তাহার জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল কালো করিয়া তুলিত। মাতঙ্গিনী বিনাইয়া বিনাইয়া তাহার জীবিত ও মৃত আত্মীয়-স্বজনকে গালাগালি করিত, এবং পরলোকে তাহার আত্মার প্রতি যৎপরোনাস্তি শাস্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য ভগবানের কাছে উচ্চকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিত। কিন্তু কেহ বলিত না যে, সে নিরপরাধ, তাহার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সে তাহার সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়াছে, এবং শেষ সম্বল দেহটাকে লাঞ্ছিত করিতে না পারিয়া, মরণকে বরণ করিয়াছে। সৎকারের ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিলে পাছে তাহার দেহ ছুঁইতে হয়, এই ভয়ে পাড়ার সকলে সরিয়া পড়িত; শেষে গ্রামের ছোটলোকেরা আসিয়া তাহার দেহটাকে ডাকিনীর গর্ভে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া আসিত।

কিন্তু সে মরে নাই। মরণের কথা তাহার মনেও আসে নাই। কারণ গ্রামের লোক তাহাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া ভাবিলেও সে তো নিজে জানিত, সে নিষ্পাপ; পাড়ার যে কোন সতীলক্ষ্মীর চেয়েও সচ্চরিত্রা। তা ছাড়া গ্রামের লোকের নিন্দায় তাহার কি যায় আসে? সে তো এ গ্রামে বেশি দিন থাকিবে না। ফটিক তাহাকে এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। কাল যখন ফটিক ভয়ে লজ্জায় মুখ কালো করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন ক্ষণিকের জন্য তাহার মন নিরাশার কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই মেঘ সরিয়া

গিয়া আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িল, ফটিকের সেই কথা, আমার ওপরে নির্ভর করুন বউদি, আপনাকে আপনার যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তবে আমার অন্য কাজ। মনে পড়িল, তাহার পুরুষোচিত দৃঢ় দৃপ্ত ভঙ্গী ; মনে পড়িল, তাহার চোখে ও মুখে নিঃসংশয়ী আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি, যে দীপ্তি ও ভঙ্গী দেখিয়া বিমলার মনে নির্ভরতা জাগিয়াছিল ; ফটিকের হাতে নিজের ভার নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া মানুষের সমাজে নূতন করিয়া জীবন-যাত্রা শুরু করিবার নিশ্চিত আশা জাগিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, ফটিক আর তাহার চেয়ে বয়সে পাঁচ বৎসরের ছোট, নেহাৎ গোবেচারা, নম্র, নিরীহ, সংসারানভিজ্ঞ, মুখচোরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে নয় ; সে পুরুষ, তাহার চেয়ে অনেক বড়, তাহার বড় ভাই ; সে তাহাকে আশ্রয় দিবে, আশ্বাস দিবে, বিপদের মুখে বুক দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে, এই অপমান ও লাঞ্ছনাময় জীবন হইতে তাহাকে লইয়া গিয়া আনন্দে দীপ্ত, তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ, সংসারের শুভকর্ম্মে ব্যাপৃত, সকলের প্রশংসা-দৃষ্টিতে অভিষিক্ত, ভাবী চরিতার্থতার আশায় রঞ্জিত জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

কিন্তু আজ ? সব আশা মিলাইয়া গিয়াছে। যে আঁধার তাহার জীবনে ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা আরও গাঢ়, আরও কালো হইয়া উঠিয়াছে ; আলোর ক্ষীণমাত্র রেখাটি পর্য্যন্ত আর নাই।. অপমান ও লোকনিন্দার ভারে ভারাক্রান্ত বলদের মত মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে ফটিক, আর উঠিবার শক্তি নাই তাহার। তাহার নবজাত পৌরুষ অকাল-প্রসূত শিশুর মত জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরিয়াছে,— ঘরের কোণে, মায়ের আঁচলের তলে আশ্রয় লইয়াছে ফটিক। কে কোথায় হতভাগিনী মেয়ে মৃত্যু অথবা নারীদেহের চরম লাঞ্ছনা, এই দুই পরিণামের মধ্যে দুলিতেছে, তাহার জন্য মাথা ঘামাইবার উৎসাহ হইবে না তাহার। মাতঙ্গিনী বলিয়াছে, ফটিক সব স্বীকার করিয়াছে। কি স্বীকার করিয়াছে সে ? সকলে মিলিয়া তাহার চরিত্রে যে কলঙ্কের কালি পোঁচের পর পোঁচ লেপিতে শুরু করিয়াছে, ফটিক কি তাহার উপর আর এক পোঁচ লেপিয়া দিয়াছে ? ফটিককে সে যতটা দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না ; তবু উৎপীড়কের উৎপীড়নের চাপে দুর্ব্বল ও ভীরুপ্রকৃতির মানুষ কি না করিতে পারে ? অথবা হয়তো সে যাহা নিছক সত্য, তাহাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তাহাকে শ্রদ্ধা করা যায় না। বিমলা শুনিয়াছে তাহাদের দেশের

ছেলেরা, একদা মরণ ও মারণ-যজ্ঞে মাতিয়াছিল, শাসনতন্ত্রের নিষ্পেষণে নিদারুণ যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করিত, তিল তিল করিয়া মরিত, তবু যাহা অপ্রকাশ্য তাহা প্রকাশ করিত না। হৃদয়ের দৃঢ়তা যাহার সামান্য আঘাতেই চূর্ণ হইয়া যায়, দেশ ও জাতিকে পরাধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবার মত দুরূহ কাজে সে কোন্ সাহসে যোগ দেয়?

কিংবা হয়তো ফটিক কিছুই স্বীকার করে নাই, নীরবে সকল লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করিয়াছে; মাতঙ্গিনী নিজে স্বীকার করিয়া আসিয়া মিথ্যা তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছে। কিন্তু যাহাই হোক, ফটিক যে তাহাকে সাহায্য করিবার আর চেষ্টা করিবে সে আশা দুরাশা। ইচ্ছা থাকিলেও তাহার মা ও দিদি তাহাকে বাধা দিবে। জগতে এমন কোন্ স্ত্রীলোক আছে, যে আর একজন নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোকের জন্য নিজের একমাত্র সন্তানকে, ভাইকে বিপদের মুখে পাঠাইয়া দিতে পারে?

অতএব, এখন তাহাকে হয় অনাহারে তিল তিল করিয়া মরিতে হইবে, না হয় আত্মহত্যা করিতে হইবে, অথবা চরম দুর্গতির মধ্যে তলাইয়া যাইতে হইবে। মাতঙ্গিনীর কথা মনে পড়িল, মরা কি এত সোজা বউ! এমন সত্য কথা মাতঙ্গিনী বোধ হয় জীবনে আর বলে নাই। মরার চেয়ে দুরূহ কাজ আর কি আছে? এইজন্য জীবনপণ শ্রেষ্ঠ পণ, জীবনবলি শ্রেষ্ঠ বলি। যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দেয়, তাহারা কি নিজে হইতে দেয়? কড়া মদ খাওয়াইয়া, মদের চেয়ে মাদক বক্তৃতা শুনাইয়া তাহাদের মাতাল করিতে হয়, তবেই তাহারা পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। খবরের কাগজে লিখিয়াছে, দলে দলে মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে গ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে ছুটিতেছে। মরণকে এড়াইবার জন্যই তো এই অভিযান! শহরে গেলেই যে তাহারা বাঁচিতে পারিবে তা নয়, যেমন করিয়া হোক বাঁচিতে হইবে—এই সংস্কারের তাড়নায় তাহারা ছুটিতেছে। এই গ্রামে একজন কুষ্ঠরোগী প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে আসে, হাতে-পায়ে একটাও আঙ্গুল নাই, সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া গিয়াছে, তবু পায়ে ন্যাকড়া জড়াইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দুপুরের তপ্ত রোদে সারা গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। রোগ ও দারিদ্র্যের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সেও তো বাঁচিতে চায়। তাহার বাপের বাড়িতে তাহার এক ঠাকুরমা, আশি বৎসরের বুড়ী, ছেলে-বউ নাতি-নাতনী

সব তাহার চোখের সামনে মারা গিয়াছে, তবু বাঁচিবার জন্য কবিরাজের ওষুধ খায়।

তবে ক্ষীরোদার মত বাঁচা! দেহের বিনিময়ে দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন! আজন্মের সংস্কার ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠে।

পেটের ভিতরটা জ্বালা করিতে শুরু করিয়াছে বিমলার, খাদ্যের অভাবে পাকস্থলীটা শূলবিদ্ধ সর্পের মত মুচড়াইতেছে, তীব্র জারকরস আকণ্ঠ ফেনাইয়া উঠিয়া বুকের ভিতরটা পোড়াইয়া দিতেছে। এখন একমুঠা ভাত পাইলে বিমলা বর্ত্তিয়া যাইত। একমুঠা ভাত, আর কিছু না, তাও দুর্লভ হইয়া উঠিল বিমলার জীবনে! এত দুর্গতি তাহার কপালে লেখা আছে কে জানিত! বড়লোকের মেয়ে নয় সে, কাকার সংসারে মানুষ, তবু ভাতের অভাব কোনদিন তাহাদের ছিল না। স্বামীর সংসারেও সাচ্ছল্য ছিল না, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের কোন উপকরণ ছিল না, কিন্তু অন্নের অভাব ছিল না। দ্বারে ভিখারী আসিলে মুষ্টি ভরিয়া ভিক্ষা দিয়াছে চিরদিন। ক্ষুধার্ত্ত আসিলে নিজে না খাইয়া থালা ভরিয়া ভাত-তরকারী সাজাইয়া দিয়াছে তাহাকে। ভাতের এত মূল্য কে জানিত? ভাতের জন্য প্রাণ দিতে হইবে, কে ভাবিয়াছিল কোনদিন! জীবন ব্যাপারে খাওয়াটা যে এত প্রয়োজনীয়, কোন দিন ভাবে নাই বিমলা। কোন দিন চাহিয়া খায় নাই সে। ছোটবেলায় খেলায় মত্ত থাকিত, কাকীমা টানিয়া আনিয়া খাইতে বসাইতেন, এক মুঠা কম খাইলে রাগ করিতেন, মারধর পর্য্যন্ত করিতেন। স্বামীর সংসারেও খাওয়াতে তাহার ভারি লজ্জা ছিল। স্বামীর সামনে কোনদিন খায় নাই সে। কতদিন স্বামী পীড়াপীড়ি করিয়াছে, অভিমান করিয়াছে, কিছুতেই রাজি হয় নাই সে। তবু তাহার খাওয়ার প্রতি স্বামীর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। খাইতে বসিবার আগে রান্নাঘরে গিয়া দেখিত, সব জিনিষ সে নিজের জন্য রাখিয়াছে কি না! এখানে থাকিলে, ভাল জিনিষ নিজে না খাইয়া তাহার জন্য পাতে ফেলিয়া রাখিত। একদিন কি একটা কারণে অভিমান করিয়া সারাদিন খায় নাই সে। সেদিন সারাদিন স্বামীর কি তোষামোদ, কত সাধ্য-সাধনা! স্বামীকে অনেক ভোগাইয়া, নাকাল করিয়া তবে খাইতে বসিয়াছিল সে। এত স্নেহ, এত ভালবাসা, সব চুকাইয়া দিয়া অসময়ে কোথায় চলিয়া গেল? যদি একটিবার আসিয়া দেখিয়া যাইত, আজ তাহার প্রাণের চেয়েও প্রিয়তমার কত দুর্দ্দশা!

কত লাঞ্ছনা! মুখ ফুটিয়া খাইতে চাহিলেও খাইতে পায় না, পায় অপমান, তিরস্কার, কুৎসিত গালাগালি।

দুই চোখ হইতে জল গড়াইতেছিল বিমলার। আঁচল দিয়া মুছিল। মুখের ভিতরটা শুকাইয়া চটচট করিতেছিল; উঠিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া কতকটা খাইল। ঘরে গুমট গরম, গামছা ভিজাইয়া গায়ে দিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

মাতঙ্গিনী ও অঘোরের হাঁকডাক শোনা যাইতেছে; রান্না হইয়া গিয়াছে বোধ হয়; ইহার পর তাহারা খাইতে বসিবে, মোটা লাল চালের ভাত, আর বোধ হয় গোটা কয়েক কচুসিদ্ধ। ফেনটা বোধ হয় রাত্রির জন্য রাখিয়া দিবে। কতদিন ভাত খায় নাই বিমলা। মিহি চালের কামিনীফুলের মত ধবধবে সাদা ভাত! ভাত সম্বন্ধে ভারি শৌখিনতা ছিল বিমলার; চাল কিছুতে পছন্দ হইত না, স্বামী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজারের সেরা চাল আনিত তাহার জন্য। বাবুদের বাড়ির মোটা চালের লাল লাল ভাত খাইতে কষ্ট হইত বিমলার। আজ সেই ভাতই অমৃত বলিয়া মনে হইতেছে। এখন যদি কেউ সেই ভাত তাহার সামনে ছড়াইয়া দিত, কুকুরের মত চাটিয়া চাটিয়া ভাতগুলো সব খাইয়া ফেলিত সে। ক্ষুধার্ত্ত মানুষ ও পশুতে কি কোন তফাৎ আছে? ক্ষুধার আগুন যখন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, মানুষের মনুষ্যত্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়া অন্তরের পশুত্ব বিকট মূর্ত্তি লইয়া বাহির হইয়া পড়ে; পৃথিবীতে কোন কাজ, যত হীন হোক, জঘন্য হোক, অসাধ্য থাকে না।

মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে বিমলার। গভীর ক্লান্তি ও অবসাদে সারাদেহটা অসাড় হইয়া আসিতেছে। মন তন্দ্রাতুর হইয়া উঠিতেছে; মস্তিষ্কের মধ্যে কত রকমের এলোমেলো চিন্তা, অতীত দিনের কত ছোটখাটো ঘটনার স্মৃতি ভিড় করিতেছে।

তাহার স্বামীর একবার অসুখ করিয়াছিল; অনেকদিন ভুগিয়া সারিয়া উঠিল। ডাক্তার ভাত দিতে দেরি করিতে লাগিল, স্বামী ভাত খাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত আবদার করিত। বিমলার ভারি ভাল লাগিত, স্বামীর অনন্যনির্ভর, অসহায় অবস্থায় বুকের ভিতরটা স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিত। কত রকমের কথা বলিয়া ভুলাইত তাহাকে। যেদিন ভাত দেওয়া হইল, সেদিন স্বামীর কি আনন্দ! কোন্ ভোরে উঠিয়া তাহাকে রান্নাঘরে পাঠাইবার জন্য কি তাড়া!

টলিয়া টলিয়া এখানে ওখানে সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করিবার কি চেষ্টা! বিমলা ধমক দিতেই কি রকম কাঁচুমাচু করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া তাহার পাশটিতে বসিয়া পড়িল। যখন খাইতে বসিল, একমুঠা বহু পুরাতন চালের পোরের ভাত, একটু-খানি ফিকে ছোট মাছের ঝোল। স্বামীর মুখে সে কি অপরিসীম তৃপ্তি! পোলাও কালিয়া খাইতে বসিয়াও কাহারও মুখে অতখানি তৃপ্তি দেখে নাই বিমলা। সেই তৃপ্ত মুখখানি আজ স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল বিমলার।

আর একটা ঘটনার কথা অনেকদিন পরে আজ হঠাৎ মনে পড়িল। তাহাদের গ্রামের জমিদারের বাড়িতে জমিদারের নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে তাহাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। অনেক বেলা হইয়া গেল, কেহ ডাকিতে আসিল না। কাকীমা বলিতে লাগিলেন, বড়লোকের বাড়ির কাণ্ড, অনেক দেরি হবে, তোরা বাড়িতে যে যা পারিস খেয়ে নে। তাহার ভাই-বোনরা, সেও খাইতে রাজি হইল না। বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ, কত ভাল ভাল খাবারের আয়োজন হইয়াছে, তাহারা বাজে যা-তা খাইয়া ক্ষুধা নষ্ট করিবে কেন? বেলা তিনটায় খাইতে বসিয়াছিল, খাওয়া শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কত রকমের তরকারি, কত রকমের মিষ্টি, দই, পায়স, রাবড়ি! সকলের শেষে রসগোল্লা যাচাই করিয়াছিল। সমস্ত ব্যাপারটা আজ এমন স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল, যেন মাত্র আগের দিন ঘটিয়াছে।

আরও কত রকমের চিন্তা! শেষে এক সময়ে বিমলা ঘুমাইয়া পড়িল।

বিকালের দিকে সারা আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-চমক ও মেঘের গর্জ্জন শুরু হইল। তারপর ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি নামিল; সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দান্ত ঝড় পশ্চিমদিগ্বলয়বর্ত্তী পাহাড়গুলা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, সারা গ্রামটাতে ও চারিদিকের মাঠে ও প্রান্তরে মাতামাতি করিতে লাগিল।

বিমলা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাকে যেন একটা ছোট অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। মেঝের উপর পড়িয়া আছে সে, হাত-পা বাঁধা, বুকের উপরে একটা প্রকাণ্ড ভারী পাথর। একটু দূরে পিছন ফিরিয়া বসিয়া মাতঙ্গিনী একটা মস্ত বড় জাঁতা ঘুরাইয়া ডাল ভাঙ্গিতেছে। ভারী পাথরটা বিমলার বুকে চাপিয়া চাপিয়া বসিতেছে, যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে সে, কিন্তু জাঁতার শব্দে তাহার চীৎকারের শব্দ শোনা যাইতেছে না মোটেই। সে আরও জোরে চীৎকার

করিতেছে, আরও জোরে জাঁতা ঘুরাইতেছে মাতঙ্গিনী। বিমলার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, এখনই মরিয়া যাইবে সে।

ঘুম ভাঙিয়া গেল বিমলার; সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, কপাল হইতে ঘাম ঝরিতেছে; উঠিয়া বসিল বিমলা। বুকের ভিতরটা সত্যই কেমন করিতেছে, নিশ্বাস লইতে ভারি কষ্ট হইতেছে; তবে কি তাহার মৃত্যু হইবে? অনাহারে মৃত্যুর এই কি আগমনপদ্ধতি? পেটের ভিতরটা পোড়া ঘায়ের মত জ্বলিতেছে। কিছু না খাইলে আর বাঁচিবে না।

বিমলা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির মাতামাতি চলিতেছে। ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে বৃষ্টিধারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কুয়াসার সৃষ্টি করিতেছে। বৃষ্টির ছাট তীরের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল বিমলার, ঝড়ের ঝাপটা ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। বিমলা টলিতে টলিতে রান্নাঘরের দিকে চলিল। দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের কোণে রাখা ভাতের হাঁড়িটার কাছে গিয়া, হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া ভাত আছে কি না দেখিতে লাগিল। হাঁড়িটা একেবারে খালি; শুকনা ফেন হাঁড়ির গায়ে লাগিয়া আছে, তলায় দুই-চারিটা ভাত পড়িয়া আছে। বিমলা খুঁটিয়া খুঁটিয়া এক টুকরা ফেনের ছিলকা ও গোটাকয়েক ভাত বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। ফেনটা খুঁজিতে লাগিল বিমলা; তন্নতন্ন করিয়া সারা ঘর খুঁজিল। কোথাও পাইল না। এ ঘরে রাখে নাই মাতঙ্গিনী, নিশ্চয়ই শোবার ঘরে ঢুকাইয়াছে। রাগে ক্ষোভে বিমলার মুখ পাথরের মত কঠিন, আগুনের মত রাঙা হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা ধকধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফুঁসিয়া উঠিল, রাক্ষুসী! পা দিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিল হাঁড়িটাকে। হাঁড়িটা গড়াইতে গড়াইতে দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া ভাঙিয়া গেল।

তারপর, উত্তপ্ত-আরক্ত লৌহখণ্ড বাতাসের স্পর্শে যেমন ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসে, বিমলাও তেমনই শান্ত হইয়া আসিল। মুখের কাঠিন্য মিলাইয়া গিয়া স্বাভাবিক কোমলতা ফিরিয়া আসিল; চোখের দৃষ্টি আবার স্নিগ্ধ শান্ত হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে দুই চোখ হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে শুরু করিল; বিমলা মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ছোট মেয়ের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বিমলা নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আবার কতকটা জল গিলিল। তারপর খোলা দরজার সামনে বসিয়া পড়িল।

মেঘের অন্তরালে দিনান্তের পালা চুকিয়া রাত্রির সূচনা হইয়া গেল। অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। ঝড় ও বৃষ্টি দুই কমিয়া আসিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল ও মেঘ ডাকিতে লাগিল বটে, কিন্তু দুইয়েরই আর তত তীব্রতা রহিল না। প্রকৃতি যেন ঘণ্টা-কয়েকব্যাপী তাণ্ডবনৃত্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া দুলিয়া দুলিয়া ঢিমা তালে নাচিতে শুরু করিল। এখন শুধু, বৃষ্টির একটানা ঝিম ঝিম শব্দ, ভেকদের ঐক্যতান, ঘরের চাল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ, মাঝে মাঝে দূরবর্ত্তী মেঘের দীর্ঘায়িত গুরুগুরু ধ্বনি, আর সকল শব্দ ছাপাইয়া একটা একটানা উচ্ছ্বসিত উদাত্ত হা-হা শব্দ—সদ্যজাগ্রতা ডাকিনীর অট্টহাসির।

ডাকিনীতে বান আসিয়াছে, গেরুয়া রঙের জলস্রোত দুই কূল ছাপাইয়া উন্মত্ত কলরবে চারিদিক মুখরিত করিয়া উদ্দাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। বিমলার মনে হইল, ডাকিনীতে ঝাঁপ দিয়া সব শেষ করিয়া দিলেই তো হয়? পাশের ঘরে মাতঙ্গিনী ও অঘোর দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে, গাঢ় অন্ধকার, এই দুর্যোগে পথেঘাটে লোকজন নাই, মরিতে যাইবার এই তো সুযোগ। কিন্তু এই ক্ষুধা লইয়া মরা? আর কবে ক্ষুধা মিটিবে? কে মিটাইবে? সন্তানহীনা সে, মৃত্যুর পরে বৎসরে একটা পিণ্ড পাইবারও আশা নাই তাহার। পরলোকেও ক্ষুধার জ্বালায় হা-হা করিয়া ফিরিতে হইবে তাহাকে।

ক্ষুধার আগুন যেন খড়ের আগুন, জল দিলেই নিবিয়া আসে, আবার ধিকিধিকি জ্বলিয়া উঠে। বিমলার পেটের ভিতরটা কিছুক্ষণ শান্ত ছিল, আবার জ্বালা করিতে লাগিল। এ জ্বালা না মিটাইয়া মরিতে পারিবে না বিমলা। তবে মরণ যদি অলক্ষ্যে আসিয়া তাহাকে অধিকার করে, সে কিছু বুঝিবে না, কিছু জানিবে না, দেখিতে দেখিতে শান্ত স্নিগ্ধ ঘুমে চোখ দুইটি চিরদিনের মত বুজিয়া আসিবে, হৃদয় স্তব্ধ হইয়া যাইবে, সারা দেহ নিথর হিম হইয়া উঠিবে, বিমলার বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা নাই মরিতে। কিন্তু চেষ্টা করিয়া, আয়োজন করিয়া মরিতে দেহের বা মনের শক্তি নাই বিমলার।

বাঁচিতেও শক্তি নাই। আজ এই দুর্য্যোগের রাত্রে বাবুগঞ্জে পলাইয়া যাইতে

পারিলে সে হয়তো বাঁচিয়া যাইতে পারিত। সেখানে অনেক লোক আছেন—যাঁহারা ভদ্র শিক্ষিত ভাল; তাহা ছাড়া ফটিকের বন্ধুরাও থাকেন সেখানে। তাহার দুর্দ্দশার কথা শুনিলে হয়তো তাঁহাদের দয়া হইত, তাহার জন্য আহার ও আশ্রয় দুয়েরই ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাবুগঞ্জ কত দূরে, কোন্ পথে, বিমলা জানে না। জানিলেও এই দুর্ব্বল দেহ লইয়া সে আজ যাইতে পারিত না।

ক্ষুধার জ্বালা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, সারা দেহ ও আত্মা খাদ্যের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে। খাদ্য চাই, আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব সহিতেছে না বিমলার। খাদ্যের জন্য দেহ কলঙ্কিত করিতেও দ্বিধা করিবে না সে। দেহ বড় না প্রাণ বড়? প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মানুষ দেহকে কত ভাবে নির্য্যাতিত করে! ছুরি দিয়া কাটে ও ছাঁটে; সুচ দিয়া বিদ্ধ করে, অ্যাসিড্ দিয়া দগ্ধ করে। দেহের রক্ষণের জন্যই দেহের নির্য্যাতন। যে প্রাণের অভাবে দেহ পচিবে, গলিবে, কৃমি-কীটে ভরিয়া উঠিবে, পশু-পক্ষীর নখে ও দাঁতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে, সেই প্রাণকে ধরিয়া রাখিবার জন্য দেহকে যদি সাময়িকভাবে লাঞ্ছিত করিতেই হয়, তো তাহাতে অন্যায় কোথায়? সাময়িক ভাবেই তো! ফটিক বলিয়াছে, নবযুগ আসিল বলিয়া, যে যুগে প্রত্যেকটি মানুষ ধন্য হইবে, সার্থক হইবে। এ তো ফটিকের নিজের কথা নয়, সে যাহাদের কাছে শিখে, যাহাদের বই পড়ে, তাহাদের কথা। সেই যুগে ক্ষীরোদার মত পাপিষ্ঠারা যদি সার্থক হইবার সুযোগ পায়, সে-ই বা পাইবে না কেন?

ক্ষীরোদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কোথায় গো বামুন-খুড়ী! মাতঙ্গিনীর দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে ক্ষীরোদা কহিল, সন্ধ্যে-রেতেই ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি গো তোমরা? মাতঙ্গিনী হড়াস করিয়া দরজা খুলিল। ক্ষীরোদা কহিল, তোমাদের যাবার কথা ছিল যে বাবুর কাছে, গেলে না? মাতঙ্গিনী কহিল, কি ক'রে যাই মা! যা দুর্য্যোগ! বুড়োকে একা ফেলে এখন আমার যাওয়াও চলে না। তোর সঙ্গেই বউকে পাঠিয়ে দিইগে, চল্। একটু থামিয়া কহিল, যেতে চাইবে কি না কে জানে! ভারি একগুঁয়ে মেয়ে কিনা, ভাঙবে তবু মচকাবে না। তুইও একটু বলিস মা বুঝিয়ে।

বিমলা উঠিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, যাচ্ছি। মাথাটা খোলা, আঁচল কাদায় লুটাইতেছে।

ক্ষীরোদা ও মাতঙ্গিনী দুইজনেই অবাক হইয়া গেল। মিনিট কয়েক চুপ করিয়া রহিল তাহারা, তারপর মাতঙ্গিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, যাক, সুবুদ্ধি হয়েছে তা হ'লে! এই যখন মনে ছিল, মিছামিছি কষ্ট পেলে। ক্ষীরোদাকে কহিল, তা হ'লে যা মা ক্ষীরোদা, নিয়ে যা। ভূপতিকে ব'লে ক'য়ে দিস, যেন লাঞ্ছনা গঞ্জনা বেশি না করে। দু তিন দিন খায় নি বউ, যেয়েই কিছু খেতে-টেতে দিস মা। আর তুইই ফিরে দিয়ে যাস মা। বিমলাকে কহিল, আর দেখো বউ, তুমিও হাতে পায়ে ধ'রো; পার তো কান্নাকাটিও ক'রো, বাবু ভাল লোক, দয়া-মায়া আছে। মন যদি ভেজাতে পার তো মাপ করবে তোমাকে। একটু থামিয়া কহিল, ভালই করেছ বউ, কত সুখে থাকবে, দেখো। গাঁয়ে যা দুর্নাম রটেছে, তা কোথায় মিলিয়ে যাবে, কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করবে না আর। ভূপতি রায় হাতে মাথা কাটলেও কারও কিছু বলবার সাধ্য নেই গাঁয়ে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জোর দিয়া কহিল, তাই তো বলেছিলাম বউ, নৌকো বাঁধতে যদি হয় তো বড় গাছেই বেঁধো, ভাঙবে না, মচকাবে না; ছোট গাছ যেমন তেমন ঢেউয়ের ধাক্কায় তলিয়ে যাবে। ওই যে ফটকের এত ফটফটানি কোথায় রইল? মারের চোটে মায়ের কোলে যেয়ে লুকিয়েছে। জীবনে আর তোমার ত্রি-সীমায় ঘেঁসবে না, দেখো। হঠাৎ কণ্ঠস্বর স্নেহে সপসপে করিয়া কহিল, মাথায় একবার চিরুনিটা বুলোলে না কেন বউমা? কাপড়খানা বদলালেই পারতে। বিমলা তীব্র কটাক্ষ করিয়াই মুখখানা ফিরাইয়া লইল।

মাতঙ্গিনী কহিল, যাও তা হ'লে, তবে একটা কথা ব'লে দিই বউমা, ভূপতি যা বলুক যা করুক, মুখ বুজে সহ্য করবে, অবাধ্য হ'য়ো না। ভূপতি যদি দয়া করে, তো তোমার দুঃখ ঘুচবে, আমাদেরও ঘুচবে।

তিক্ত ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিমলা কহিল, আপনাদের দুঃখ ঘুচবে কেন? মাতঙ্গিনী চোখ বড় করিয়া কহিল, আমাদের দুঃখ ঘুচবে না, বল কি বউমা? হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভূপতির মত ছেলে আমাদের—। রাগে বিমলার মুখখানা টকটকে রাঙা হইয়া উঠিল, তাহার ইচ্ছা হইল, কুৎসিত গালি দেয় মাতঙ্গিনীকে, নখ দিয়া নির্লজ্জার মুখখানা ছিঁড়িয়া দেয়। দাঁতে দাঁত চাপিয়া, তীব্রদৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর চাপা গলায় ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, তোমাদের দুঃখ ঘুচবে না। এমনই ক'রেই আমাকে যদি বাঁচতে

হয়, তা'হ'লে তোমরা যাতে তিল তিল ক'রে মর, তার ব্যবস্থা করব আমি। মাতঙ্গিনী গালে হাত দিয়া মিনিট কয়েক বিমলার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল; তারপর খনখন করিয়া বলিয়া উঠিল, শুনলি মা ক্ষীরোদা, বউয়ের কথা? যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর! আমরা মরছি ওর ভালর জন্যে, আর ও চাচ্ছে আমাদের মারতে! হঠাৎ ক্ষীরোদার হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, তুই আছিস মা, আমাদের মেয়ের বাড়া তুই; কালসাপিনী যা বলছে তাই করবে; তুই আমাদের দেখিস মা। ভূপতিকে ব'লে আমাদের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিস।

ক্ষীরোদা ও বিমলা ভূপতি রায়ের বাগান-বাড়ির দিকে চলিল। রাস্তায় জল জমিয়াছে; পায়ের পাতা ডুবিয়া গেল। ছপছপ শব্দ করিতে করিতে চলিল দুইজনে। গাঢ় অন্ধকার; মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। রাস্তায় লোকজন নাই; এ রাস্তায় সন্ধ্যার পরে লোক-চলাচল সচরাচর কম। রাস্তার দুই ধারে নালা দিয়া কলকল শব্দে জল ছুটিয়াছে; জলের উপরে, মাটির উপরে, গাছ ও ঝোপ-ঝাপের পাতার উপরে একটানা ঝিমঝিম শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে; মাঝে মাঝে জলতরঙ্গের বাজনার মত শব্দ হইতেছে টুং-টাং; থাকিয়া থাকিয়া হু-হু শব্দে পূর্ব্বদিক হইতে দমকা বাদলা হাওয়া ছুটিয়া আসিয়া গাছের ডালপাতা নাড়া দিয়া ঝরঝর শব্দে জল ঝরাইতেছে; এবং সারা পল্লীর আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ডাকিনী হা-হা শব্দে অবিরাম গর্জ্জন করিতেছে।

বিমলার মাথার মধ্যেও একটানা ঝমঝম শব্দ, যেন করতাল বাজিতেছে। শরীর আর তাহার চলিতে চাহিতেছে না, পা টানিয়া টানিয়া অতি কষ্টে চলিতেছে সে। বিমলার মাথায় ঘোমটা নাই; খোঁপা খুলিয়া চুলগুলা পিঠে ও কাঁধে লুটাইতেছে; দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ; কি দেখিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কোন কিছুরই যেন বোধ হইতেছে না বিমলার; দম দেওয়া পুতুলের মত নির্লিপ্ত, নিরুদ্দেশ্য, নির্ব্বিকার ভাব।

ক্ষীরোদার মাথায় ছাতা ছিল, কহিল, ভিজছ কেন গো, কাছে এস না। বিমলা জবাব দিল না। ক্ষীরোদাই কাছে সরিয়া আসিয়া বিমলাকে ছাতার নীচে লইল, বিমলা আপত্তি করিল না। ক্ষীরোদা কহিল, কাপড়খানা ভিজে গেল যে

তোমার! বিমলা নীরব। ক্ষীরোদা জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, বাবুর ধুতি পরবে এখন যেয়ে, বাবুর সঙ্গে একদেহ একপ্রাণ হবে তো এবার, তুমিই হবে বাড়ির গিন্নী, সংসারে সব্বেসব্বা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ধুতি কেন, কালো কস্তা-পেড়ে শাড়ি পরাবে বাবু তোমাকে—অনেকদিনের সাধ বাবুর, তোমার ধবধবে ফর্সা রঙে কেমন মানাবে, দেখো! এক টুকরা হাসিয়া কহিল, আমার কথা ফলল তো! বলেছিলাম, আমার মিতেন হবে তুমি—হতেই তো হ'ল শেষে। বিমলা কোন কথারই জবাব দিল না। আরও কিছুক্ষণ পরে ক্ষীরোদা কহিল, ডাকিনীতে বান এসেছে, সাপিনীর মত গজরাচ্ছে পোড়ারমুখী। ডাকিনীর বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মরতে ইচ্ছে করে, পারি না; প্রাণের এমনই মায়া! না হ'লে আমার মত হতভাগীর আবার বাঁচতে হয়! ক্ষীরোদার কণ্ঠস্বর কান্নার চেয়ে করুণ।

৭

বৈঠকখানায় চওড়া তক্তাপোশের উপর ঢালা ফরাশে তাকিয়া ঠেসদিয়া ভূপতি ঝিমাইতেছে, সামনে একটা মদের বোতল, একটা কাচের গেলাস। পাশেই একটা টেবিলের উপর একটা থালায় লুচি তরকারি—একটা বড় বাটিতে মাংসের কালিয়া, একটা রেকাবিতে মিষ্টান্ন। ভূপতির রাত্রের খাবার। লোকজন আশে-পাশে কেহ নাই। এই দুর্য্যোগে মোসাহেবরা অনেকে আসে নাই; দুই-একজন যাহারা আসিয়াছিল, ভূপতি তাহাদের ভাগাইয়া দিয়াছে। বিমলার সহিত আজ বোঝাপড়া হইবে তাহার। রূপসী যুবতী বিমলা। গ্রামের অনেক মেয়েমানুষের সহিত কারবার করিয়াছে ভূপতি, ভদ্রগৃহস্থের বধূও বাদ যায় নাই, কিন্তু বিমলার মত এতখানি তেজ কাহারও মধ্যে দেখে নাই। সেদিন তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র ক্রুদ্ধা সাপিনীর মত দুই চক্ষে আগুন জ্বালিয়া সে ফুঁসিয়া উঠিয়াছিল, আপনি কি মানুষ, না পশু! রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ভূপতির। নেশাও ধরিয়াছিল। তারপর বিমলা যতই তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, ততই তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার বাসনা দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। তবু ধবধবে সাদা কাপড়ে কালি লাগাইতে হইলে মন যেমন স্বতঃই সঙ্কুচিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়, বিমলাকে পাইবার জন্য তাহার অনুক্ষণ চেষ্টাও তেমনই একটি সঙ্কোচ ও দ্বিধার

দ্বারা এতদিন বাধাগ্রস্ত হইতেছিল। কাল রাত্রে ফটিকের সঙ্গে বিমলার গোপন সম্পর্ক সর্ব্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইবার পর তাহার মনে লেশমাত্র সঙ্কোচ ও দ্বিধা নাই। আজ যদি বিমলা আসিতে না চায়, ভূপতি জোর করিয়া তাহাকে আনাইবে।

ক্ষীরোদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, বামুন-বউ এসেছে। ভূপতি লাল চোখ দুইটা মেলিয়া কহিল, কি বলছিস? ক্ষীরোদা হাসিয়া কহিল, বউ এসেছে, বিমলা-বউ। বলিয়া চোখ দিয়া ইশারা করিবার চেষ্টা করিল। ভূপতি গ্রাহ্য না করিয়া কহিল, কই? ভেতরে আসতে বল। ক্ষীরোদা কহিল, এস গো। বিমলা দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি খাড়া হইয়া বসিয়া আদেশের স্বরে কহিল, ভেতরে এস। ক্ষীরোদা বিমলাকে ধরিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। বিমলা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপতি ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, কি, এখন এলে যে? লোক ফিরিয়ে দিলে না? তেজ কমেছে তা হ'লে? ক্ষীরোদা কহিল, নিজে থেকেই এসেছে, তিন দিন কিছু খায় নি। ভূপতি মুখ টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, জানি। ক্ষিদের জ্বালায় বাঘিনী বশ হয়, মেয়েমানুষ হবে না? তা এখনই যদি এলে, এত লেজে না খেলে আগে এলেই পারতে?

বিমলা মুখ তুলিয়া কহিল, আমাকে কিছু খেতে দিন। ভূপতি কহিল, দোব বইকি। চোখের ইঙ্গিতে টেবিলের উপরে খাবারের থালাটাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ওই সব খাবার তোমায় দোব, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার তো অত সস্তায় পাওয়া যায় না; মোটা দাম চাই।—বলিয়া কুৎসিত হাসি হাসিতেই চোখ দুইটা ছোট হইল, চোখের কোণ কুঁচকাইল এবং ঠোঁটের দুই প্রান্ত ঝুলিয়া পড়িল।

প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে বিমলার মুখটা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল; নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া চোখে জল আসিল; অনিবার্য্য অধোগতি হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য শেষ চেষ্টায়, করুণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আপনি জমিদার, আমার বাবার মত, এমন ক'রে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করবেন না।

ভূপতি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তোমার বাবার মত আমি! কত বয়স বল দেখি আমার? তোমার স্বামীর বয়সী, তার চেয়েও দেখতে খারাপ নয়, ক্ষীরোদাকেই জিজ্ঞেস কর না!—বলিয়া ক্ষীরোদার দিকে কটাক্ষ করিতেই

ক্ষীরোদা মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইল। পরক্ষণেই ভূপতি গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কটুকণ্ঠে কহিল, তোমার আবার ধর্ম্ম আছে নাকি যে নষ্ট হবে। ফটকের সঙ্গে রাতের পর রাত কাটিয়ে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নি, আর আমার সঙ্গে—বিমলা বাধা দিয়া কহিল, মিথ্যা কথা। ভূপতি কহিল, মিথ্যে নয়, সত্যি। তোমার শাশুড়ী এই কথা ব'লে গেছে, রঙ্গলাল নিজের চোখে দেখেছে, ফটকেও স্বীকার করেছে। ক্ষীরোদার দিকে তাকাইয়া কহিল, তুইও তো কাল ওকে আর ফটককে অন্ধকারে কথা বলতে দেখেছিস, না? ক্ষীরোদা উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ তো। কি গো বউ, দেখি নি? এটাও কি মিথ্যে কথা? বিমলা একবার ক্ষীরোদার দিকে তাকাইয়া মুখ নামাইয়া লইল।

ভূপতি কহিল, ওসব কথা যাক। ফটকে যে আমার চোখের সামনে তোমাকে ভোগ করবে, আমার হাত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাবে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করব না। শাস্তি তাকে দিয়েছি, আরও দোব, যদি সামলে না থাকে। অশ্রদ্ধার হাসি হাসিয়া কহিল, আমাকে ছেড়ে তুমি ফটকের ওপর নির্ভর করলে? কি আছে ওর? বিঘে কয়েক জমি আর ধান। আমার কাছে অনেক দেনা ওদের, নালিশ করলেই সব কিছুতে টান পড়বে, ভিটে পর্য্যন্ত বাদ যাবে না; নিজেই খেতে পাবে না, তোমাকে খাওয়াবে কি? ওসব কুবুদ্ধি ছাড়, আমার কাছে থাকলে সারাজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে, কোনদিন কোন অভাব থাকবে না। বিশ্বাস না হয়, ক্ষীরোদাকে জিজ্ঞেসা কর।

বিমলা নির্ব্বাক নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল; সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল তাহার; তাহা দেখিয়া ক্ষীরোদা কহিল, বউয়ের কাপড়খানা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে, একখান ধুতি আপনার দেন ওকে।

ভূপতি কহিল, দোব, তুই এখন যা। ক্ষীরোদা চলিয়া গেল।

ভূপতি কহিতে লাগিল, আজ তো নিজে হতেই এসেছ শুনছি। খুব ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? ক দিন খাও নি? তিন দিন? ইচ্ছে ক'রে নিজে কষ্ট পেলে তুমি, আমি কি করব? এখানে এসে ব'স, যত ইচ্ছে খাও, তোমার জন্যই আনিয়ে রেখেছি। বিমলা তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপতি কহিল, কি গো আসছ না যে? বুকে জড়িয়ে তুলে আনতে হবে নাকি? লোভে, লালসায় ও বিমলার অবাধ্যতার জন্য রাগে হিংস্র পশুর মত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল,

এখানে যখন পা দিয়েছ, তখন আর নিস্তার নেই তোমার। জোর ক'রে তোমার গায়ে হাত দোব, কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তারপর তোমাকে ভোগ ক'রে লাথি মেরে দূর ক'রে দোব। দম লইয়া কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ কোমল করিয়া কহিল, আর যদি ভাল মানুষের মেয়ের মত আমার কথা শোন, যা বলি তাই কর, যা চাইবে তাই পাবে; কোন অভাব থাকবে না তোমার। তারপর লুচির থালাটা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া, তক্তাপোশের উপর রাখিয়া আদেশের স্বরে কহিল, এখানে এসে ব'সে খাও, এস।

বিমলা মুখ তুলিয়া একবার ভূপতির মুখের দিকে তাকাইল, তারপর তাকাইল থালা-ভরা খাদ্যের দিকে। ক্ষুধানল দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সেই অনলে দ্বিধা সঙ্কোচ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, রহিল শুধু চিত্তের আদিমতম বৃত্তি, বাঁচিবার স্পৃহা, তাহারই তাড়নায় সে এক পা এক পা করিয়া আগাইয়া গেল।

৮

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া তাকাইয়া বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কোথায় আসিয়াছে সে? এ কাহার ঘর? কাহার আসবাবপত্র? কাহার শয্যা? তাহার অঙ্গে এ কাহার কাপড়? চোখ ফিরাইয়া ভূপতিকে দেখিয়া লোকে শয্যায় সাপ দেখিলে যেমন ভাবে উঠিয়া বসে, তেমনই ভাবে উঠিয়া বসিয়া খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। স্রস্ত বসন সামলাইয়া কিছুক্ষণ ভূপতির দিকে তাকাইল। ভূপতি ঘুমাইতেছিল, দেহটা প্রায় উলঙ্গ, মুখটা ফোলা, নীচের ঠোঁটটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দুই কষ হইতে লালা গড়াইতেছে, নাকটা ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধ সাপের মত গর্জ্জন করিতেছে। বিমলার সারা দেহ ঘিনঘিন করিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইতে সমস্ত ব্যাপার মনে পড়িল বিমলার। মনে পড়িল, ক্ষুধার জ্বালায় সে ভূপতির ঘরে আসিয়াছিল। ভূপতি জোর করিয়া তাহাকে মদ খাওয়াইয়াছে, হয়তো মাংসও খাওয়াইয়াছে; তাহার দেহকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। তাহার এতদিন ধরিয়া তিল তিল করিয়া গড়া জীবনকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। কিছুই বাকি নাই তাহার—আত্মীয় নাই, আশ্রয় নাই, পথের কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য নিরাশ্রয় সে।

তীব্র বিবমিষা বিমলার পাকস্থলিটাকে পাকাইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল;

সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বারান্দার ধারেই বমি করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে সামলাইয়া বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই চোখ হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছিল। দরজার পাশে তাহার ভিজা কাপড়টা পড়িয়া ছিল, ভূপতির কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়া সে সেইটি পরিল। তারপর ধীরে ধীরে পুকুরের বাঁধা ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল।

সূচীভেদ্য অন্ধকার; আকাশে মেঘের ঘটা; সিরসির করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে; আবার বৃষ্টি নামিবে বোধ হয়। বিমলা ঘাটের রানার উপরে প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল, বাঁচিবার জন্য এ কি করিয়া বসিলাম? এমনই করিয়া বাঁচা কি সত্যকার বাঁচা? মানুষের কাছে ঘৃণ্য, সমাজে অপাঙক্তেয়, ধর্ম্ম হইতে পতিত, সুস্থ সহজ জীবন হইতে চিরদিনের মত ভ্রষ্ট। কি হইবে এমন জীবন লইয়া? ইহার চেয়ে মরণ ঢের ভাল।

সুদীর্ঘ বঙ্কিম রেখায় মেঘের বুক চিরিয়া সহসা বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল। সেই আলোকে বিমলার চক্ষুর সম্মুখে পুকুর, বাগান, পুকুরের ওপারে বিষ্ণুমন্দিরের বেড় ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সেই তড়িতালোকে বিমলার মনশ্চক্ষুর সামনে একটা মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার নিজেরই পূজারিণী মূর্ত্তি। শুদ্ধ-স্নাত দেহ, পরিধানে টকটকে লালপাড়ের সাদা গরদের শাড়ি; পিঠের উপরে লুটানো ভিজা চুলের রাশির উপরে স্বল্প অবগুণ্ঠন, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা; ভক্তি-নম্র মুখখানিতে শান্ত পবিত্রতা। পূজা করিবার অধিকার হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়াছে বিমলা; দেবতা-মন্দিরের দ্বার চিরদিনের জন্য তাহার কাছে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিমলার সারা দেহে অসহ্য অস্বস্তি, মনের মধ্যে অপরিসীম যন্ত্রণা, সারা মনে যেন একসঙ্গে সহস্র সহস্র হুল ফুটিতেছে। এই যন্ত্রণার কি শেষ হইবে কোনদিন, না আমরণ চলিবে? ফটিকের নবযুগ কবে আসিবে, কেমন করিয়া আসিবে কে জানে, কিন্তু অনুক্ষণ মনের মধ্যে এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহিয়া বিমলা আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

৯

রাত্রি তিনটার সময়ে মাতঙ্গিনী আসিয়া হাঁকাহাঁকি শুরু করিল, ভূপতি! ও বাবা ভূপতি! বারান্দার এক প্রান্তে রঙ্গলাল ঘুমাইতেছিল, হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল তাহার। উঠিয়া বসিয়া স্বাভাবিক ভারী কর্কশ গলায় হাঁক দিয়া কহিল, কে গা? কে? মাতঙ্গিনী কাছে আসিতে আসিতে কহিল, কে রে? রঙ্গলাল? হ্যাঁ বাবা, আমার বউ কই? রঙ্গলাল কহিল, কি জানি আজ্ঞে! রেতে আর নাই বা খোঁজ করলেন, সকাল না হতে হতেই বাড়িতেই পাবেন; এখন ঘর যান। মাতঙ্গিনী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, ঘর যাব কি রে? বউ কোথায়? রঙ্গলাল বার কয়েক চোখ মিটমিট করিয়া কহিল, আপনি সব জেনে শুনে চেঁচামেচি করছেন কেন বলুন দেখি? ঘর যান এখন। মাতঙ্গিনী কহিল, সে কি কথা রে? কোন্ সন্ধ্যে-রেতে এসেছে বউ, আমি কত রাত পর্য্যন্ত জেগে ব'সে, ভাবি, এই আসে, এই আসে; শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি; খানিক আগে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, বাইরের দরজা খোলা, বউ আসে নি। ভূপতিকে একটিবার ওঠা বাবা। অনেক তোষামোদের পর রঙ্গলাল ভূপতির ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ভূপতিকে ডাক দিল। অনেক ডাকের পর ভূপতির শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে রে? রঙ্গলাল? রঙ্গলাল কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বামুন-গিন্নী ওর বউকে খুঁজতে এসেছে, বলছে বউ বাড়িতে নেই। ভূপতি কহিল, নেই তো আমি কি করব? ব'লে দে, এখানে নেই, অন্য জায়গায় খোঁজ করতে বল্‌গে যা। মাতঙ্গিনী কান্নার সুরে বলিয়া উঠিল, এখানেই যে এসেছিল বাবা! ভূপতি ধমকাইয়া কহিল, এসেছিল তো কি হবে, এখান থেকে অনেকক্ষণ গেছে। যাও এখান থেকে। মাতঙ্গিনী ভয়ে ভয়ে কহিল, বাড়িতে নেই বাবা, কোথায় গেল তা হ'লে? ভূপতি রঙ্গলালকে কহিল, তুই যা তো ওর সঙ্গে, বাড়িতে আছে কি না দেখ্‌গে যা, না থাকে ফটকের ওখানে দেখবি।

কিছুক্ষণ পরেই রঙ্গলাল ফিরিয়া আসিয়া ভূপতিকে ডাকিয়া কহিল, বাবু, ভারি বিপদ, বউ গলায় দড়ি দিয়েছে।

ভূপতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ভীত কণ্ঠে কহিল, সে কি রে?

রঙ্গলাল কহিল, এজ্ঞে হ্যাঁ, দেখবেন আসুন।

রঙ্গলালের পাছু পাছু গিয়া ভূপতি দেখিল, ঘাটের পাশেই একটা বেঁটে আম-

গাছের ডাল হইতে বিমলার দেহ ঝুলিতেছে। ভূপতির পরিতে দেওয়া ধুতিটাই গলায় বাঁধিয়া মরিয়াছে বিমলা।

মাতঙ্গিনী একটানা মিহি সুরে কাঁদিতেছিল, ওরে বাবা! আমার এ কি হ'ল রে! ভূপতিকে দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, চুপ। টুঁ শব্দটি করবে তো ভাল হবে না বলছি। গলা টিপে মেরে শাশুড়ী-বউকে একসঙ্গে পুঁতে দেওয়াব। মাতঙ্গিনী চুপ করিয়া গেল। ভূপতি রঙ্গলালকে কহিল, ফকরে আর মাণকেকে ডাক্। রঙ্গলাল, ফকির ও মাণিক এই তিনজন ভূপতির বিশ্বস্ত ভৃত্য, অনেক কুকর্ম্মের সাক্ষী তাহারা; অনেক গোপন কাহিনী তাহারা জানে, কিন্তু কোনদিন কোন কথা প্রকাশ করে নাই।

রঙ্গলাল, মাণিক ও ফকির আসিল। বিমলার মৃতদেহটা গাছ হইতে খুলিয়া মাটিতে নামাইল। ভূপতি কহিল, ডাকিনীতে ফেলে দিয়ে আয়গে যা। মাণিক ও ফকির মৃতদেহটাকে কাঁধে লইল, রঙ্গলাল সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সকলে যাইতেই মাতঙ্গিনী আবার কাঁদিয়া উঠিল, ও বউমা, কোথায় গেলে গো? ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, চুপ কর, তোমাদের কোন ভাবনা নেই। মাতঙ্গিনী কান্না থামাইয়া কান্নার সুরে কহিল, আর কি আমাদের খেতে দেবে বাবা? যা দিতে হয়, আজই দাও। ভূপতি কহিল, কি চাই তোমার? মাতঙ্গিনী কহিল, বাড়ির দলিল ফিরে দাও, বউয়ের বন্ধকী গহনাগুলো দাও, আর কিছু টাকাও দাও বাবা। না হ'লে আমাদের চলবে কি ক'রে? ভূপতি কহিল, আচ্ছা, এস।—বলিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিল।

মাতঙ্গিনী বারান্দায় বসিয়া ছিল। ভূপতি আসিয়া দলিল ও গহনার পুঁটুলিটা তাহার সামনে ফেলিয়া দিল। মাতঙ্গিনী দলিলটা তুলিয়া লইয়া ভূপতি দলিলের মাথাটা ছিঁড়িয়া দিয়াছে কি না পরীক্ষা করিল। তারপর কহিল, এক কলম নিখে দিলে না বাবা? ভূপতি বিরক্তির স্বরে কহিল, দিয়েছি। দলিল ও গহনার পুঁটলিটা কোঁচড়ে পুরিয়া মাতঙ্গিনী কহিল, কিছু টাকা দিলে না? ভূপতি রাগত কণ্ঠে কহিল, মাগী জ্বালিয়ে মারলে!—বলিয়া টাকা আনিবার জন্য ঘরে ঢুকিল। মাতঙ্গিনী কহিল, খুচরো টাকা আর রেজকী দেবে বাবা, না হ'লে কোথায় ভাঙাব, পাড়াগাঁ!

কতকগুলা টাকা, রেজকি ও পয়সা আনিয়া মাতঙ্গিনীর সামনে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল ভূপতি। মাতঙ্গিনী কুড়াইয়া লইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, কাল থেকে বিনে পয়সায় চাল-ডালের ব্যবস্থা ক'রে দিও; বুড়ো-বুড়ীর জন্যে ত্বখান কাপড় কিনে দিও বাবা। আর ফটকেকে মানা ক'রে দিও; যেন আমার কাছে গিয়ে আমাকে না উসকোয়, ভারি বজ্জাত ছোঁড়াটা।

ভূপতি কড়া গলায় কহিল, ফটকের জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না; তুমি নিজে ঠিক থেকো কিন্তু। যদি টুঁ শব্দটি কর, তো মেরে এমনই ক'রে ডাকিনীতে ভাসিয়ে দোব তোমাকে। মাতঙ্গিনী কহিল, সে কথা আর আমাকে বলতে হবে না বাবা। কালই রটিয়ে দোব, বউ ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তুমি কিন্তু আমাদের ভুলে থেকো না বাবা। ফ্যাঁচ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, এমন বউ আমার জন্মের মত ঘুচিয়ে দিলে বাবা! সারা জীবন ধ'রে খেতে পরতে দিলেও তা শোধ হবে না।—বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভূপতি রাগে দাঁতে দাঁত পিষিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, শয়তানী! শতমুখী প্রতিধ্বনি চারিদিক হইতে প্রত্যুত্তর দিল।

যেমন করিয়া হোক বাঁচিয়া থাকা জীবধর্ম্ম। কিন্তু ইহাতে মানুষ তৃপ্তি পায় না। শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সে বাঁচিতে চায়। এই জন্যই মাঝে মাঝে মানুষের জীবন সমস্যা-সঙ্কুল হইয়া উঠে। সমস্যার সমাধান করিয়াই মানুষ মনুষ্যত্ব লাভের পথে অগ্রসর হয়। বিমলার জীবনেও সমস্যা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু জীবন শেষ করিয়া দিয়া বিমলা সকল সমস্যার সমাপ্তি করিয়াছে।

শুধু বুঝে নিলে নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল নারী,
প্রমোদ-রাতে রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তারি।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত